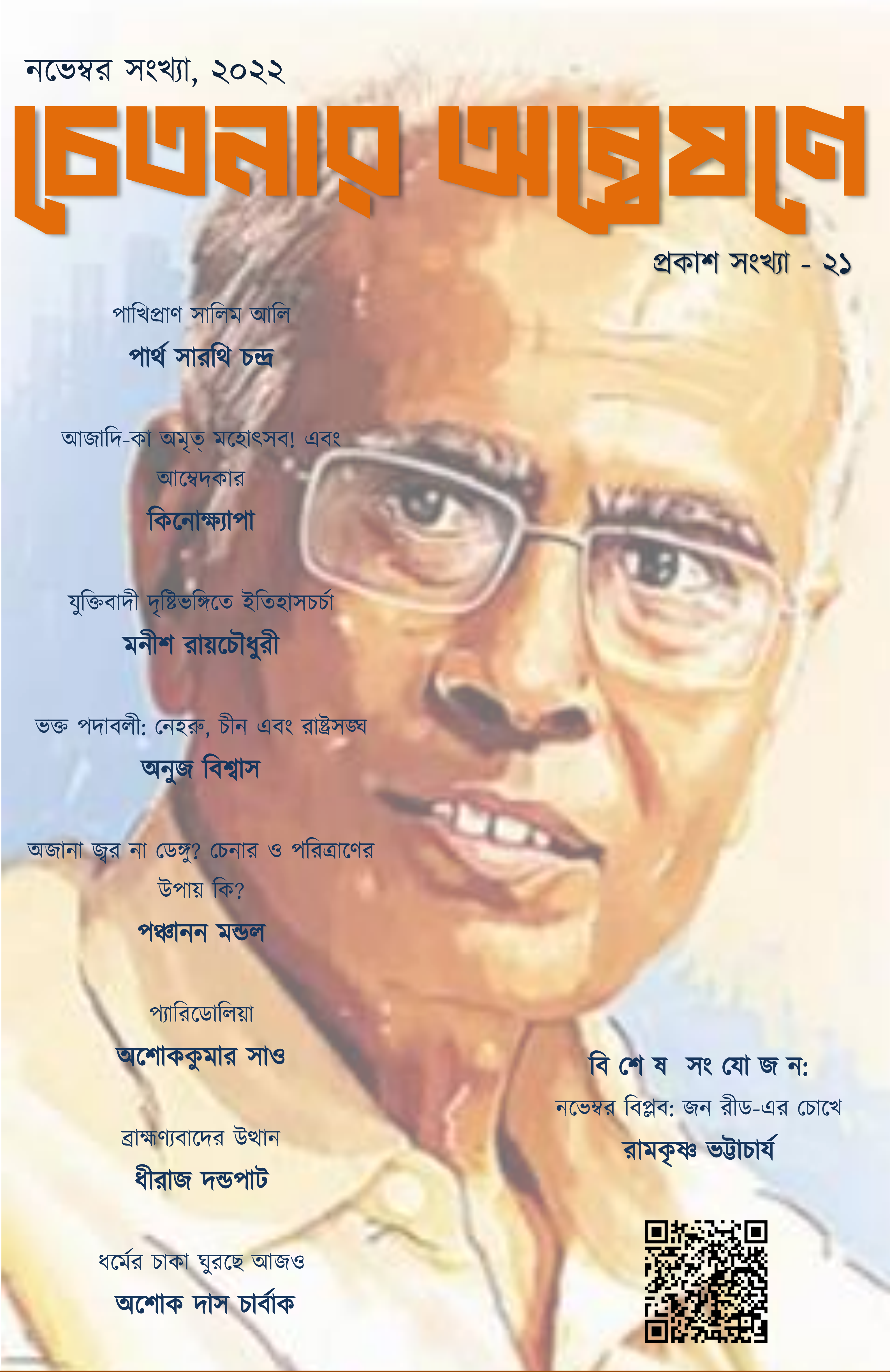
নভেম্বর সংখ্যা, ২০২২

চেতনার অন্বেষণে

প্রকাশ সংখ্যা - ২১



পাখিপ্রাণ সালিম আলি
পার্থ সারথি চন্দ্র

আজাদি-কা অমৃত্ মহোৎসব! এবং আম্বেদকার
কিনোক্ষ্যাপা

যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসচর্চা
মনীশ রায়চৌধুরী

ভক্ত পদাবলী: নেহরু, চীন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ
অনুজ বিশ্বাস

অজানা জ্বর না ডেঙ্গু? চেনার ও পরিত্রাণের উপায় কি?
পঞ্চানন মন্ডল

প্যারিডোলিয়া
অশোককুমার সাও

ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান
ধীরাজ দন্ডপাট

ধর্মের চাকা ঘুরছে আজও
অশোক দাস চার্বাক

বি শে ষ সং যো জ ন:
নভেম্বর বিপ্লব: জন রীড-এর চোখে
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| নভেম্বর সংখ্যা, ২০২২

স ম্পা দ ক
যু ক্তি বা দী রা

প্র কা শ সং খ্যা
এ কু শ

স হা য় তা য়
মধুমিতা, অরিন্দম, পার্থপ্রতিম, দেবস্মিতা, সাগ্নিক, সজল, শক্তি, লর্ড নিও, উপেন ও কিনোক্ষ্যাপা

যো গা যো গ
yuktibadira@gmail.com
WhatsApp@9564556134
Telegram:@Yuktibadira
Website:rationalists
ক ল কা তা - ৫ ৬

বি নি ম য় মূ ল্য না ই

সূ চি

প্র ব ন্ধ - নি ব ন্ধ:

○ সম্পাদকীয় | ০৪
○ বৈজ্ঞানিক মেজাজ এবং দাভোলকার – তন্ময় | ০৬
○ পাখিপ্রাণ সালিম আলি – পার্থ সারথি চন্দ্র | ১২
○ টিকে থাকার লড়াইয়ে ‘ধর্মগুলো সব রূপকথা’ - জাহিদ রুদ্র | ৩২
○ কেন এদেশে হিন্দুরা বিপদে? - রাহুল রায় | ৩৯
○ বিশ্বাস ও বিজ্ঞান এক নয় – মুজিব রহমান | ৪৬
○ আজাদি-কা অমৃত্ মহোৎসব! এবং আম্বেদকার - কিনোক্ষ্যাপা | ৫০
○ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসচর্চা - মনীশ রায়চৌধুরী | ৬৪
○ সিভিলাইজেশন স্কেল - সেখ রামিজুল করিম | ৭৪
○ ভক্ত পদাবলী: নেহরু, চীন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ – অনুজ বিশ্বাস | ৮২
○ বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞানচর্চা, কুসংস্কার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভুমিকা – চার্বাক কাজী | ৯২
○ বিজ্ঞান ও ধর্ম – শুভ্রসরকার | ৯৯
○ যুক্তিবাদীর খোঁজে - মহম্মদ মহসীন | ১০৩
○ বিশ্বাসে বিষ – শম্ভুনাথ চার্বাক | ১১০
○ অন্য গ্রহের আগন্তক বনাম ইমাম মাহাদী – সাহাদাত হোসেন | ১১৬
○ পিতৃতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ – ঈশা চক্রবর্তী | ১২৩
○ নাস্তিক এবং আস্তিক – জসিমুদ্দিন আহমেদ | ১২৬
○ তেত্রিশ কোটি দেবতার সত্যতা - কৃষ্ণ সরকার | ১৩৭
○ ক্ষমা করো ডারউইন – প্রবীর ব্যানার্জি | ১৪১
○ প্রসঙ্গ: আন্দোলন – রাজু দত্ত | ১৪৫
○ ছট পুজো বাস্তবতা – সৌরাষ্ট্র দাশ | ১৪৭
○ অবিশ্বাসের ব্যবসা ভাঙতে হবে – সায়ক সরকার | ১৫২
○ তালাক - তালাক - তালাক - অভিষেক দে | ১৫৫
○ রাজনীতিক নজরুল- সংকেত হক | ১৭৭
○ অজানা জ্বর না ডেঙ্গু? চেনার ও পরিত্রাণের উপায় কি? – পঞ্চানন মন্ডল | ১৮৬
○ ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন হোন - পার্থপ্রতিম পাল | ১৯৬
○ উল্কার সাতকাহন – অনির্বাণ মন্ডল | ২১০
○ প্যারিডোলিয়া (Pareidolia) - অশোককুমার সাও | ২১৪
○ কেন বার বার ওঠে ঝড় – সৌমিত্র চৌধুরী | ২১৯

- ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান – ধীরাজ দন্ডপাট | ২৩১
- সরস্বতী পূজা – জামাল আনসারী | ২৪৭

ক বি তা:

- ধর্মের চাকা ঘুরছে আজও - অশোক দাস চার্বাক | ২৫০
- মানুষ হও - সজলকান্তি টিকাদার | ২৫৫
- নিয়ম - প্রদীপ চক্রবর্তী | ২৫৮
- আমার ধর্ম – সুমন বিশ্বাস | ২৬০

বি শে ষ সং যো জ ন

- নভেম্বর বিপ্লব: জন রীড-এর চোখে – রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | ২৬২

যে লেখাটি পড়তে চান সূচিপত্রে সেটিতে ক্লিক করুন।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি। **পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও।** যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে 'চেতনার অন্বেষণে'র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি মুক্তচিন্তক ও
যুক্তিবাদী
চিত্রদীপ সোম মহাশয়কে।
তাঁর বলিষ্ঠ লেখার সাথে আমরা সবাই পরিচিত,
শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

সম্পাদকীয়

নভেম্বর সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে জানাই যে গতমাসের সংখ্যাটি সকলের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। আমরা হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটি তৈরি করেছি যার লক্ষ্য মুক্তচিন্তকদের এক জায়গায় জড়ো করা এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সংযোগ আরও দৃঢ় করা। এই মুহূর্তে কমিউনিটিতে তেরো'শ জনেরও বেশি মানুষ এবং ১১টি গ্রুপ মিলে 'চেতনার অন্বেষণে' কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। এই কমিউনিটিতে আমরা টেলিগ্রামের মতই যুক্তিবাদীদের প্রয়োজনীয় বই-প্রবন্ধ তুলে ধরব।

পত্রিকা নিয়ে প্রচুর পরামর্শ পেয়েছি, মেহেবুব আলম-দার কথা না বললেই নয়। আর সর্বোপরি পত্রিকা, বই বেশি বেশি পড়ুন এবং লিখুন। মোবাইলকেই বই পড়ার কাজে লাগান, অতিরিক্ত সোস্যাল সাইটের ব্যবহার মোটেও কাজের কথা নয়। 'চেতনার অন্বেষণে' গুরুগম্ভীর তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ এরকম লেখাই চায় তা নয়, মুক্তচিন্তকরা যাতে হাতে কলম তুলে নেয় এবং যেমন পারেন লেখালেখির শুরু করে সেটিতেই উৎসাহিত করছে, তাই পাঁচ দশ লাইন লিখলেও পাঠানও যায়। সাম্প্রতিক সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সাথে প্রাসঙ্গিক লেখালেখির জন্য সবাইকে কিছুটা বেশি উৎসাহিত করছি।

২৮, নভেম্বর, ২০২২

চেতনা

একটি মুক্তচিন্তকদের বই ভাণ্ডারে আসুন -

লিংক

অথবা টেলিগ্রামে সার্চ করুন - @Yktibadira

কমিউনিটিতে যুক্ত হওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ –

লিংক ১

লিংক ২

লিংক ৩

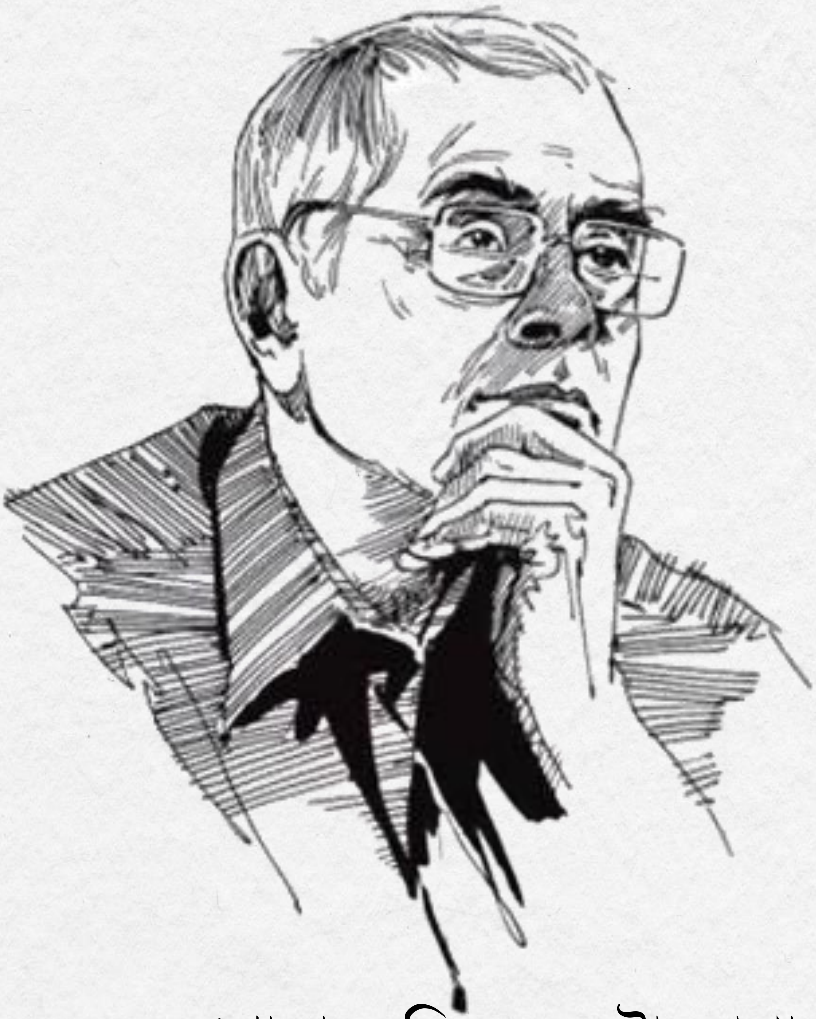
।। প্রশ্ন করুন যুক্তিবাদীদের ।।

যুক্তিবাদ, আপাত অতি-প্রাকৃত ঘটনা, ঈশ্বর বিশ্বাস, কোনও কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা ইত্যাদি সংক্রান্ত যে কোনও উত্তরের খোঁজ করে থাকলে প্রশ্নটি যুক্তিবাদীদের বলতে পারেন। প্রশ্নটিকে সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে পৌছে দেব, এবং উত্তর পাবেন আগামী সংখ্যায়।

প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

বৈজ্ঞানিক মেজাজ এবং দাভেলকার

লি খে ছে ন – ত ন্ম য়



দ্রুম, দ্রুম। দু'খানা গুলি। একটা মাথার পেছন দিক থেকে আর আরেকটা পড়ে যাওয়ার পর ডান চোখে। নরেন্দ্র দাভেলকারকে এইভাবেই গুলি করে হত্যা করেছিলেন হিন্দুত্ববাদীরা।

সমাজে বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরীর প্রক্রিয়ায় ডঃ নরেন্দ্র দাভেলকারের অদম্য সাহসী ভূমিকায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন মৌলবাদী শক্তি। বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন অগ্রণী সৈনিককে খুন করে সমগ্র বিজ্ঞান আন্দোলনকে হারিয়ে দেওয়ার উগ্র বাসনায়

উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল হিন্দুত্ববাদী 'সনাতন প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে। "one gets what one deserves." অর্থাৎ, "তার যা পাওনা ছিল সেটাই তিনি পেয়েছেন।" এটাই ছিল পত্রিকা গোষ্ঠীর মনোভাব। ওরা জানেন না যে মস্তিষ্ককে কারাগারে বন্দী করে বা মস্তিষ্কে গুলি করে একটা মানুষকে আটকানো যেতে পারে কিন্তু তার চিন্তাধারাকে আটকানো যায় না। তা আরও ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্র শক্তি সর্বদা মানুষের চেতনা ও মানসিকতাকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে অত্যন্ত সক্রিয়। একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের ব্যাপকতা আর সক্রিয়তা পারে রাষ্ট্র শক্তির এই আগ্রাসী মনোভাবকে প্রতিহত করতে। সেই লক্ষ্যেই তিনি কুসংস্কার মুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগড়ার জন্য বিজ্ঞান আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজে বহমান নানাবিধ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তবে শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হতেন না বরং মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতেন।

জাতপাত, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, দলিতদের সমানাধিকারের পক্ষে, মারাঠা

বিশ্ববিদ্যালয়কে সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকারের নামাঙ্কিত করতে যেমন দাভেলকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তেমনি প্রতিটি গ্রামে একটি করে পানীয় জলের কুপের দাবিতে, প্রান্তিক মানুষদের মদ্যপানের আসক্তি দূর করতে, সশক্তিকরণ ও আত্মমর্যাদা জাগ্রত করার লক্ষ্যে, জলদূষণ রুখতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবন বা সামাজিক জীবন সার্বিকভাবে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রয়াস জারি রাখতে প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিটি ঘটনার পেছনে কার্যকারণ সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা খুব জরুরী। আর এইজন্য চাই প্রশ্ন করার আর প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার বৈজ্ঞানিক মেজাজ। ততটুকুই গ্রহণীয় যতটুকুর সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, এই বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরী করার কাজটা সুচারুভাবে করেছিলেন তিনি।

মানুষের সাথে বন্ধুর মত মিশে, মানুষের জীবনসংগ্রামের সাথী হয়ে, মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সামিল করার প্রয়াস প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাজ। আর এই কাজে ঔদ্ধত্য নয়, সাহসী এবং বিনয়ী হতে হবে। সেই বিনয় আর সাহস সঙ্গী

করে দাভেলকার গড়ে তুলেছিলেন মহারাষ্ট্র অনিস অর্থাৎ মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি। ব্যাক্তি ও পারিবারিক জীবনে আপাদমস্তক কুসংস্কার বর্জন করা মানুষটি সমাজ জীবনেও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চালিয়ে গিয়েছিলেন আপোষহীন লড়াই। বেশ কয়েকজন কুসংস্কারের প্রচারক গুরুবাবাজিদের ভন্ডামি ফাঁস করার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। চলমান বিজ্ঞান ভ্যানের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসারের অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সর্বোপরি তৈরী করেছিলেন কুসংস্কার ও জাদুবিদ্যা বিরোধী আইনের সেই ঐতিহাসিক খসড়া যা সারা ভারতে যুক্তিবাদী মানুষের সংগ্রামের পাথেয়।

যুগে যুগে কোনো যুক্তিশীল চিন্তাধারার মানুষদের কাজ কখনও সহজ হয়নি। ওনার কাছেও এই কাজ সহজ ছিল না। বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বক্তৃতা বন্ধের চক্রান্ত, ম্যাগাজিন বিক্রি না করার ফতোয়া এমনকি প্রাণনাশের হুমকি নিয়েই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অকুতোভয় মানুষটির পুলিশি সুরক্ষাও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

যদিও শেষ পর্যন্ত প্রাণ রক্ষা হয়নি। দাভেলকার এবং তারপরও আরও কয়েকজন যুক্তিবাদী প্রগতিশীল মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

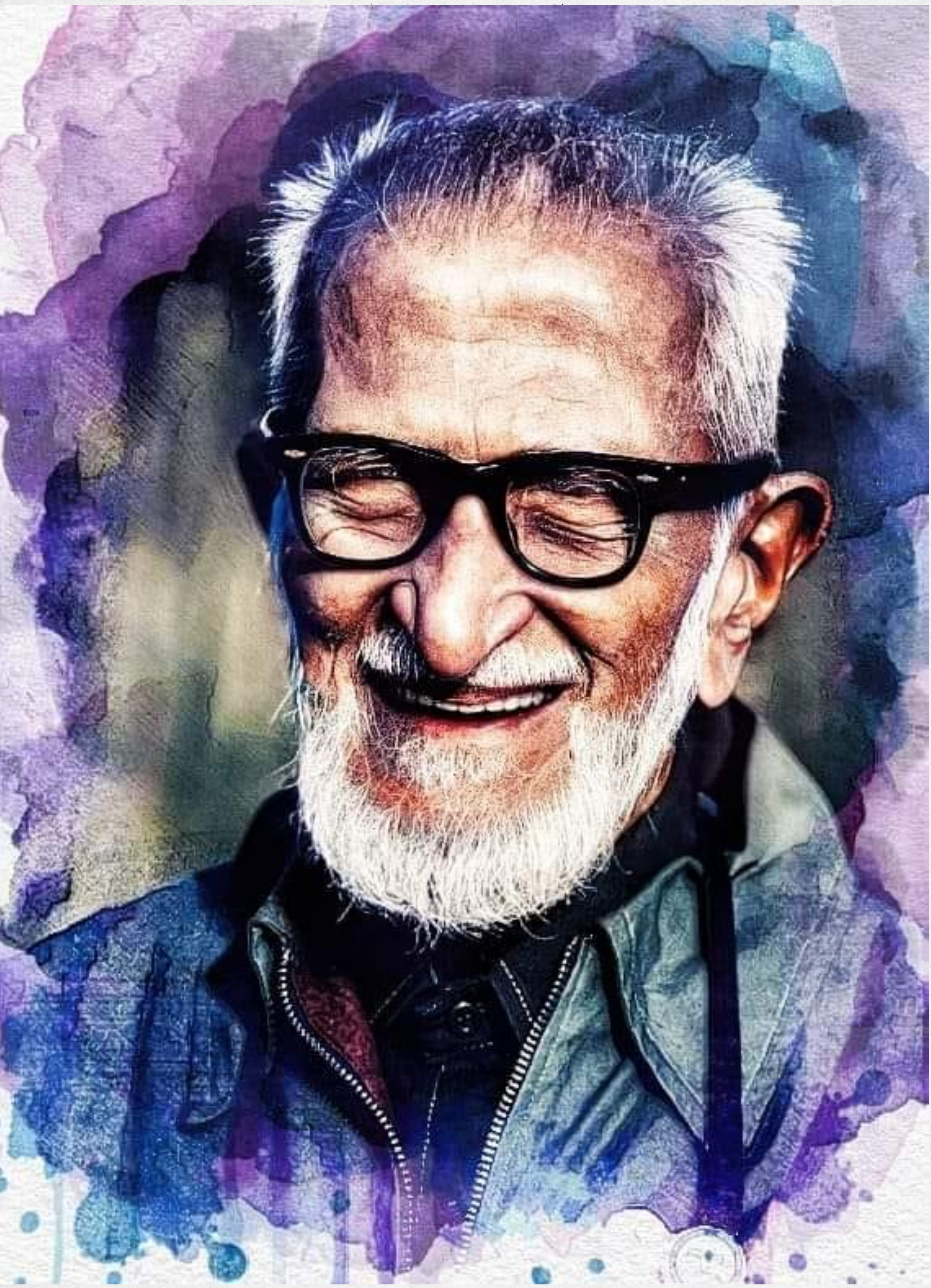
প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী থেকে সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক। বিজ্ঞানীরা সোচ্চারে বলেছিলেন, “we, scientists now join our voices to Theirs (the writers) to assert that the Indian people will not accept Such attacks on reason, science and our plural culture. we reject the destructive narrow view of India that seeks to dictate what people will wear, think, eat and who they will love. we appeal to all other sections of society to raise their voice against the assault on reasons and scientific temper we are witnessing in India today.”

ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি দাভেলকারদের এই ‘Scientific temper’ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরির প্রক্রিয়া আমাদের কাছে শিক্ষনীয়। তাই এই প্রক্রিয়া

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আমরা এই দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

“আমাদের বেশিরভাগ সামাজিক সমস্যাই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে চাওয়ার অভাব থেকে। একটা গণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার মাধ্যমে যদি সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা অর্জন করে, তাহলে তার মাধ্যমে সে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।”

- নরেন্দ্র দাভেলকার



পাখিপ্রাণ সালিম আলি

লিখেছেন – পার্থ সারথি চন্দ্র

১৯৫০ সাল। সুইডেনের উপশালাতে বসেছে পক্ষীবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্রথম অধিবেশন শুরু হতে তেমন দেরি নেই, পৌঁছে গিয়েছেন প্রায় সবাই।

একজন ভারতীয় অবশ্য তখনও পৌঁছননি। কী হবে? কোথাও আটকে গেলেন নাকি? অনুপস্থিত থাকবেন? এমন ভাবনা যখন ঘুরছে আয়োজকদের মনে তখন হঠাৎ মোটরসাইকেলের গর্জন। একটা সানবীম মডেল ব্রেক কষে দাঁড়াল সভাঘরের বাইরে। নামলেন সেই ভারতীয়। মুহূর্তের মধ্যে খবর চাউর হয়ে গেল যে ভারত থেকে সোজা বাইকে করে উপশালা পৌঁছেছেন এক ভারতীয় পক্ষীবিদ! যার কথা হচ্ছে তিনি সালিম আলি।

চুয়ান্ন বছর বয়সে ফিল্মি হিরোর মত বাইকে করে আবির্ভূত হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যাঁর। এতটাই আকর্ষণ মোটরবাইকের প্রতি যে একটা মডেল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না তিনি, শুধু হার্লে-ডেভিডসনেরই তিন রকম মডেল ছিল তাঁর কাছে। এছাড়াও একটা করে ডগলাস, স্কট, নিউ হাডসন এবং জেনিথ মোটরবাইক চালিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। অবশ্য সানবীমের গল্পটা পুরোপুরি সত্যি নয়। ভারত থেকে গোটা পথ ঐ বাইকে পাড়ি দেননি তিনি। বম্বে থেকে জাহাজে করে ইউরোপে আনান বাইকটা, উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনের আগে সেটাতে করে ইউরোপ চক্কর দেওয়া। এই কাজ করতে গিয়ে ফ্রান্সে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় পড়লেন, জার্মানীর মসৃন, বাঁধানো রাস্তায় আছাড়ও খেলেন বেশ কয়েকবার। তাতে কী? ভালবাসার জন্য কতকিছু করা যায়, হাত-পায়ে চোট তো সামান্য ব্যাপার। প্রবন্ধের শুরুতে ঝাঁকুনি খেয়ে পাঠক হয়ত প্রশ্ন তুলে ফেলেছেন, সালিম আলি কোনটা বেশী

ভালবাসতেন, পাখি না মোটর বাইক? জানা নেই উত্তরটা, তবে বাকি প্রবন্ধ তাঁর পক্ষীপ্রেমের আলোচনায় নিবেদিত। সালিম আলির পক্ষী-পর্যবেক্ষণের কৌশল ছিল মুঘল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের মত - দ্রুত ধারণা তৈরি করা কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠা বজায় রাখা।

যে কোনো শাখার একনিষ্ঠ গবেষক সেই শাখার গভীরতা বুঝতে তার ইতিহাস পাঠ করেন নিবিড়ভাবে। নিজের উপলব্ধি পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের কাছে। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কাজটা করেছিলেন ‘আ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি’-র মাধ্যমে। সালিম আলি ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখনী ও বিভিন্ন বক্তৃতার মঞ্চ। ষোড়শ আজাদ মেমোরিয়াল লেকচারে সালিম আলি তুলে আনলেন ভারতবর্ষের পক্ষীচর্চার ইতিহাস। মুঘল আমলের আগে পাখিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হলেও সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চেষ্টা শুরু হয় বাবরকে দিয়ে। সালিম আলির মন্তব্য, চালু ধারনাকে আশ্রয় করে পাখির বর্ণনা তৈরি করতেন না সম্রাট বাবর। একটা উদাহরণ - শীতকালে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মোনাল ফিজ্যান্ট (monal pheasant) নেমে আসে পাহাড়ের পাদদেশে। ওড়ার পথে ফিজ্যান্টের দল যদি কোনো আঙুরক্ষেতের উপর দিয়ে যায়, তখন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে যায় সেখানেই। বাবর লিখছেন, ‘এইসব কথার সত্যতা ঈশ্বরই জানেন। আমি বুঝি যে এর মাংস বেশ সুস্বাদু।’ ইতিউতি

কথায় যে বাবরের আস্থা নেই এবং পক্ষীকুলের বর্ণনায় যে সেগুলোকে কোনো স্থান দেননি তিনি, এটা তার দৃষ্টান্ত।

তবে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যিনি পাখি সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন নিবিড়ভাবে, তিনি জাহাঙ্গীর। তার সম্পর্কে বলা হয়, সম্রাট না হয়ে তিনি যদি কোনো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রধান হতেন তবে হয়ত অনেক বেশি সুখী হতেন। এমনই ছিল তার পক্ষীপ্রেম। রাজসভায় তিনি স্থান দিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর ওস্তাদ মনসুর-কে। তাঁর কাজ ছিল নতুন পাখির ছবি আঁকা। জাহাঙ্গীরের আগ্রহ জানতেন তাঁর সাম্রাজ্যের সবাই, এমনকি বিদেশীরাও। তাই নজরানা হিসাবে তারা নিয়ে আসতেন তাদের এলাকার বিশেষ প্রজাতির পাখি। সেগুলো সম্রাটের হাতে পৌঁছনো মাত্রই তিনি মনসুরকে নির্দেশ দিতেন পাখির নিখুঁত ছবি আঁকতে।

সৌভাগ্যক্রমে, এর মধ্যে বেশ কিছু ছবি আজও সংরক্ষিত রয়েছে। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরেও সম্ভবত রয়েছে তার নমুনা। ছবির পাশাপাশি পাখির চেহারা, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতেন জাহাঙ্গীর।

সেইসব বর্ণনা ধরা রয়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৬২৪ পর্যন্ত চলে জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা রচনা। এই সময়ের মধ্যে কত যে পাখির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সালিম আলি জানিয়েছেন যে তাঁর দরবারে ডোডো পাখিও পৌঁছেছিল। তবে সেটা ১৬২৪

সালের পরে। ফলে সেটার ছবি থাকলেও স্মৃতিকথায় কোনো উল্লেখ নেই।

জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য বা আরো পরে মুঘল সাম্রাজ্য ছারখার হওয়ার পরে সম্রাটের সংগৃহীত বহু নমুনা বিশ্বের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে। স্রেফ লুটের খেলা চলছিল তখন। যিনি পাখির নমুনা চুরি করছেন, তিনি হয়ত জানেনও না তার গুরুত্ব। লুটেরাদের দলে অবশ্যই ছিল ব্রিটিশরা। কিন্তু তাঁদের অপরাধের পাশাপাশি গুণপনাও কিছু কম ছিল না। ব্রিটিশ রাজপুরুষদের অনেকেরই আগ্রহ ছিল পাখিদের সম্পর্কে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতে প্রথম পাখি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক সংকলন তৈরী করেছিলেন ব্রিটিশ সাহেব জার্ডন। ১৮৬২ এবং ১৮৬৪ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বার্ডস অফ ইন্ডিয়া'-র দুটো খন্ড। এর পরে যে খামতি ছিল তা পূরণ করেন দুজন ভারতীয় - সালিম আলি এবং সিডনি ডিলো রিপলে। দশ খন্ডে তাঁরা প্রকাশ করেন 'হ্যান্ডবুক অফ দ্য বার্ডস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'। প্রকাশকাল ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩। এতগুলো খন্ড প্রকাশের পরও, যে বিষয়টা সালিম আলিকে চির-অতৃপ্ত রেখেছিল তা হল পাখিদের স্থানীয় নামের নির্ভরযোগ্য তালিকা সম্পূর্ণ করতে না পারা। এর অভাবে জনপ্রিয় বই যে তৈরী করা মুশকিল তা বিলক্ষণ জানতেন তিনি।

জনপ্রিয়করণের এই আগ্রহ যে সারা জীবন তাঁর মধ্যে ছিল, তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। পরিণত বয়েসে একবার

তিনি প্রতিষ্ঠিত পক্ষীবিদ রিপলেকে বেশ রাগ করেই লেখেন যে পক্ষীচর্চার সবটাই যদি কাঠ-কঠিন নামকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তিনি ছেড়েই দেবেন বিষয়টা। অরণ্যে পাখিদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অধ্যয়ন ছেড়ে তিনি এমন ট্যাক্সোনমির যুদ্ধ করতে আগ্রহী নন। মজার কথা, প্রাণীবিজ্ঞানে সালিম আলির প্রশিক্ষণ মাত্র এক বছরের। ১৯১৭ সালে দুটো কলেজে একসাথে ভর্তি হন তিনি। একটাতে পড়াশোনার বিষয় ছিল আইন ও হিসাবশাস্ত্র। অন্যটাতে প্রাণীবিজ্ঞান।

দুটোই সম্পূর্ণ করেন তিনি। অবশ্য শুধু সময়ের 'দৈর্ঘ্য' দিয়ে এই সময়টাকে মাপলে চলবে না। এই সময়েই তিনি যুক্ত হতে শুরু করেন বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির সঙ্গে। তার কেরিয়ার গঠিত হতে শুরু করে এই জায়গা থেকে। তবে ওই সোসাইটির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় যে নিতান্ত শৈশবে, তা তো পাঠক মাত্রেই জানেন। ঘটনাটা এইরকম। একটা চড়ুই পাখি মেরেছিল ছোট্ট সালিম, তাঁর খেলনা এয়ারগান দিয়ে। সোসাইটির সম্পাদক মিলার্ড সাহেব সেই পাখি দেখে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পাখির শরীরে ব্যতিক্রমী রঙের বিস্তার দেখে মনোযোগী হলেন তিনি। চিহ্নিত করলেন পীৎকণ্ঠ চড়ুই হিসাবে। এরপরে, বলা যায় পুরস্কার হিসাবে, সোসাইটির stuff করা পাখির সংগ্রহ দেখালেন। এই বিশেষ চড়ুইয়ের কথা সালিম আলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য ফল অফ আ

স্প্যারো' তে। মৃত চড়ুই তাঁকে পাখির জগতের দরজা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রির সঙ্গে তাঁর যোগ যে কতটা নিবিড় ছিল তা বোঝাতে ১৯৮৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করব। প্রবন্ধের শিরোনাম 'বায়োলজি আন্ডার দ্য রাজ'। সোসাইটির শতবর্ষ পূর্তিতে এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখা হয়েছে (অনুবাদ):-

"১৯৩০ থেকে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির কাহিনী নির্ধারিত হয়েছে সালিম আলি নামে এক ক্ষীণদেহীর দ্বারা। কোনো ডিগ্রী নেই, জীববিজ্ঞানের প্রশিক্ষণও দূর অস্ত, তিনি বার্মায় কাঠ ব্যবসায়ীর পেশা ছেড়ে নিজের জীবন নিয়োজিত করেন পক্ষীচর্চায়। আজ ৮৭ বছর বয়সেও তিনি সমান সক্রিয় এবং দেশে বিদেশে সোসাইটির সঙ্গে তাঁর নাম সমার্থক। তাঁর ভূমিকার তাৎপর্য দুরকম: প্রকৃতিবিদ হিসাবে এবং প্রশাসক রূপে। যদিও প্রানীদের সমীক্ষার সাথে মূলত যুক্ত ছিলেন তিনি, প্রান্তরে-অরন্যে গিয়ে প্রাণীর আচরণ ও বাস্তুতন্ত্রের সংস্কারমুক্ত, সরল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ইতিহাস চর্চার প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলেন। বিশেষ করে বাবুই পাখির সামাজিক জীবন সম্পর্কে তাঁর গবেষণা, মুক্ত ভাবনা এবং স্পষ্টতার দিক দিয়ে কিছু বছর আগে great crested grebes এর উপর জুলিয়ান হাক্সলির করা গবেষণার সঙ্গে তুলনীয়।"

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সালিম আলি ভরতপুরকে চাষের ক্ষেতে পরিবর্তিত হওয়া থেকে বাঁচান।



তবে সোসাইটির পুরোভাগে থাকাকালীন কিছু বিতর্কেও জড়িয়ে পরেন তিনি। স্বাধীনতার পরে যখন রাজস্থানের ভরতপুরে মহারাজার অধীনে থাকা কেওলাদেও ঘানা বার্ড স্যাংচুয়ারি ভেঙেচুরে চাষের ক্ষেত বানানোর জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষ আন্দোলন শুরু করে, তখন তিনিই প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বাঁচান ভরতপুরকে। অবশ্য মহারাজার শিকারের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রজননের ঋতুতে শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা পড়ে। পাখির জন্য এলাকার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যেতেও দ্বিধা করেননি তিনি। অবশ্য নেহাৎ আবেগের বশে একাজে লিপ্ত হননি সালিম আলি। তিনি দেখান যে ভরতপুর পার্শ্ববর্তী এলাকাকে দেয় অনেক কিছু - গবাদি পশুর খাবার, জ্বালানি কাঠ, ফল এবং বাড়ির ছাউনির জন্য

খড় ইত্যাদি। চাষের ক্ষেত তৈরি হলে এর থেকে বেশি উপকৃত যে নাগরিকরা হবেন না, তা বোঝে সরকার। পাশ হয় ভরতপুরের অরণ্য ও জলাভূমি অটুট রাখার সিদ্ধান্ত। এই ভরতপুরকেই ন্যাশনাল পার্ক করার আগ্রহ দেখান সালিম আলি। এই আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয় দাবি - গবাদি পশুকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না এই এলাকায়। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে সোসাইটির করা এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে গবাদি পশু না ঢুকলে এক বিশেষ ধরেণের আগাছা বাড়ছে হু হু করে। এরা জলের মধ্যে মাছের জীবনকেও সীমিত করে দিচ্ছে। ফলে মাছের সংখ্যা কমছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে কমে যাচ্ছে জলের পাখি। এই সমীক্ষায় সহযোগী হয় ইউনাইটেড স্টেটস ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী সচিব ডেভিড চালিনর ১৯৮০ সালে আসেন এই সমীক্ষায় অংশ নিতে। হতবাক হয়ে তিনি চিঠি লেখেন রিপলেকে। রিপলে বিষয়টা নিয়ে লেখেন সালিম আলিকে।

তবে সোসাইটির পুরোভাগে থাকাকালীন কিছু বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েন তিনি। স্বাধীনতার পর যখন রাজস্থানে ভরতপুরের মহারাজার অধীনে থাকা কেওলাদেও ঘানা বার্ড স্যাংচুয়ারি ভেঙেচুরে চাষের ক্ষেত বানানোর জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষ আন্দোলন শুরু করেন তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বাঁচান

ভরতপুরকে। অবশ্য মহারাজার শিকারের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রজনন ঋতুতে শিকারে নিষেধাজ্ঞা পড়ে, পাখির জন্য এলাকার সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে যেতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। অবশ্য শুধু আবেগের বশে এ কাজে লিপ্ত হননি সালিম, তিনি দেখান যে ভরতপুর পার্শ্ববর্তী এলাকাকে অনেককিছু দেয়-গবাদি পশুর খাবার, জ্বালানি কাঠ, ফল এবং বাড়ির ছাউনির জন্য খড় ইত্যাদি। চাষের ক্ষেত তৈরি হলে এর থেকে বেশি উপকৃত যে নাগরিকরা হবেন না, তা বুঝে সরকার পাস করে ভরতপুরের অরণ্য এবং জলাভূমি অটুট রাখার সিদ্ধান্ত। ভরতপুরকে ন্যাশনাল পার্ক করার আগ্রহ দেখান সালিম। এই আগ্রহর সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন দাবি যেমন, গবাদি পশু প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। কিন্তু সোসাইটির এক সমীক্ষায় দেখা যায় গবাদি পশু ঢুকতে না দিলে আগাছার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যা জলের মধ্যে মাছের জীবনকেও সীমিত করে দিচ্ছে। এই সমীক্ষায় সহযোগী হয় ইউনাইটেড স্টেটস ফিশিং অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী সচিব ডেভিড ১৯৮০ সালে ভারতে আসেন এই সমীক্ষা তদারকি করতে। তিনি গবাদি পশুর অবাধ বিচরণের পক্ষে রায় দেন। প্রায় এক দশক ধরে চলা বিতর্কের পর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় সোসাইটির প্রতিবেদন। তখন সালিম এই পৃথিবী ছেড়ে

চলে গেছেন। ক্রমেই গবাদি পশুর জন্য ভরতপুরের পাখিদের দৈন্যদশা প্রকট হতে শুরু করেছে।

১৯০৬/০৭ বাইরে পুরুষ চড়াইটি কাঠের গোঁজে বসে আছে। গর্তের প্রবেশপথের প্রায় মুখে। ভেতরে স্ত্রী চড়াই ডিমে তা দিতে বসেছে। আস্তাবলের কাছে একটি ঘোড়ার গাড়ির পেছনে নিজেকে আড়াল ক'রে অতর্কিতে আমি তাদের উপর আক্রমণ করলাম। পুরুষ চড়াইটা গুলি খেয়ে মরল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে দেখি মেয়েটি এক ফাঁকে আরেকটি পুরুষ-চড়াই জুটিয়ে এনেছে। সেও বাইরের গোঁজটাতে ভর দিয়ে 'পাহারা'য় বসে গেছে। এই মরদটিকেও আমি ঘায়েল করলাম। চোখের পলকে দেখি মেয়েটি আবার এক মরদ এনে হুজুরে হাজির করেছে। পরের সাত দিনে ঐ একই দাঁড়ে-বসা গুটি আষ্টেক পুরুষ চড়াইকে আমি সাবাড় করি।...'

নয়-দশ বছর বয়সে এই কথাগুলো ডায়েরিতে লিখেছিলেন সেলিম আলি! উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয়দের কাছে 'পক্ষী সংরক্ষণ' ব্যাপারটা ছিল কল্পনাতীত। বরং পশুপাখি শিকারে যে যত কামাল দেখাতে পারবে সে তত বড় পুরুষসিংহ। শিকার-শিকার খেলতে খেলতেই সেলিম হয়েছিলেন বার্ডম্যান অব ইন্ডিয়া।

মাত্র তিন বছর বয়সে সেলিম মা-বাবাকে হারান। অনাথ হয়েও পাঁচ ভাই ও চার বোনের সঙ্গে সেলিম নিঃসন্তান মামা-মামির কাছে বড়ই আদরে মানুষ হয়েছিলেন। মামা আমিরউদ্দিন ছিলেন বড় শিকারি। সাহেবরা তাঁকে

নেকনজরে দেখতেন। নয় বছরের ছোট্ট সেলিমকে তিনি একটি এয়ারগান উপহার দিয়েছিলেন। ছোট থেকেই মাসে ২ টাকা হাতখরচ পেতেন সেলিম। সেই টাকা জমিয়ে মুম্বইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেটের পাখির বাজার থেকে নানা ধরনের পাখি কিনে, তারের জাল ও প্যাকিং বাক্স জুড়ে খাঁচা বানিয়ে তাতে পাখিগুলিকে রাখতেন। এমনও হয়েছে, বাড়িতে মেহমানদের জন্য বস্তাবন্দি তিতির বা বটের পাখি এসেছে। সে সব সুস্বাদু পদ হওয়ার আগেই বস্তা খুলে জ্যান্ত পাখি চুপিসারে সরিয়ে ফেলতেন। সেই সব পাখিদের জায়গা হত খাঁচায়।

বড়দের অলক্ষে খুদেদের এই সব কাজে সাহায্য করত বাড়ির পুরনো ভৃত্য নান্নু। আত্মজীবনী 'ফল অব আ স্প্যারো'-তে সেলিম লিখেছেন, তিনি বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন না খাঁচার বন্দি পাখিগুলিকে। তার পরেই হাতে আসে এয়ারগান। সেলিমের বাড়ির ভিতরে ছাদে বারান্দায় ছিল অগুনতি চড়াইয়ের বসবাস। চোখের সামনে এত চড়াই ছিল প্রশিক্ষণের জন্য মোক্ষম। তিনি জেনে নিয়েছিলেন, মুসলমান সন্তান হিসেবে চড়াইয়ের মাংস গ্রহণে পাপ নেই। কিন্তু তা উপযুক্ত হালাল হওয়া চাই। মৃত চড়াইকে হালাল করার পদ্ধতি, কী ভাবে তেল মশলা দিয়ে এদের সদগতি করতে হবে, সবই শিখেছিলেন নান্নুর কাছেই!

এমনই এক দিন, শিকারের পর এক চড়াইপাখি হালাল করতে গিয়ে তার চোখ আটকে গেল পাখির গলায়। এ

তো ঠিক পরিচিত চড়াইয়ের গলার মেটে দাগ নয়। তা হলে? মৃত পাখিটির গলায় ঝোল পড়ার দাগের মতো হলদে ছাপ। হালাল না করে মৃত পাখিটিকে নিয়ে গেলেন মামার কাছে। মামাও এর বিহিত করতে না পারায় একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন 'বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র তৎকালীন অবৈতনিক সেক্রেটারি ডব্লু এস মিলার্ড-এর কাছে। সোসাইটির ভিতরে দেওয়াল জুড়ে মাউন্ট করা জীবজন্তু, শো কেসে সাজানো প্রজাপতি ও পাখির ডিম, দেওয়ালে টাঙানো চিতাবাঘ-বাঘের মাথার খুলি... প্রথম বার এই সব দেখে সেলিমের ছোট্ট মনে একরাশ বিস্ময় তৈরি হয়। তৈরি হয় কৌতূহল। সেই কৌতূহলই সেলিমের জীবন বদলে দিয়েছিল। প্রথম দিনের এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সেলিম আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'এটা নিশ্চয় ১৯০৮ সালের কোনও একটা সময়ে ঘটে থাকবে। বি এন এইচ এস-এর সঙ্গে সেই আমার প্রথম যোগাযোগ। পরে আমার জীবন গড়ে তুলতে এবং বিশেষ একটি খাতে বইয়ে দিতে এই যোগাযোগ বড় রকমের সাহায্য করেছিল।'

পাখি ও প্রকৃতির বাইরে সেলিম আলি পাগল ছিলেন আর একটি ব্যাপারে। সেটি হল মোটরসাইকেল! কাজের সূত্রে মায়ানমারে গিয়ে প্রথম তাঁর হাতে আসে মোটরসাইকেল, 'জেনিথ'। 'হার্লে ডেভিডসন', 'ডগলাস', 'স্কট', 'নিউ হাডসন' এবং 'মেক'... সেরা কোম্পানিগুলির মোটরসাইকেল ব্যবহার করেও তাঁর আমৃত্যু আফসোস ছিল বিএমডব্লু-র মোটরসাইকেল ব্যবহার করার সুযোগ

পাননি বলে! বছর-বছর মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনে কোথায় কী নকশা বদলাল, তা জানার জন্য তিনি মুখিয়ে থাকতেন। কৌতূহল মেটাতেন মোটরবাইক সংক্রান্ত বিভিন্ন জার্নাল আর প্রস্তুতকারকদের ক্যাটালগ পড়ে। নতুন মোটরসাইকেল হাতে এলেই, তিনি তার ইঞ্জিন খুলে বোঝার চেষ্টা করতেন, কোম্পানি নতুন কী যন্ত্রপাতি তাতে দিল এবং কেন দিল। সপ্তাহান্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতেন মোটরসাইকেলের ভিতর ও বাইরে পরিষ্কার করতে।

১৯৫০-এ সুইডেনে আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক কংগ্রেস-এ তিনি একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বাইক ‘সানবিম’। একটাই উদ্দেশ্য, ওই বাইকে করে গোটা ইংল্যান্ড চষে বেড়ানো। তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

সালিম আলি সারা জীবন নিজেকে দেখেছেন একজন শখের বা অ্যামেচার পক্ষীবিদ হিসাবে। অথচ তিনিই তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন পেশাদারিত্বের সুউচ্চ মান। বিজ্ঞানী মাধব গ্যাডগিল-এর মতে তাঁর পর্যবেক্ষণের কৌশল ছিল মুঘল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের মত - দ্রুত ধারণা তৈরি করা কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠা বজায় রাখা।

হয়ত আবেগের বশে কোথাও-কোথাও তিনি কিঞ্চিৎ সরে গিয়েছেন যুক্তির নিগড় থেকে। তবে তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময় ছিল পাখিদের সংরক্ষণ। কেবল

সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি নয়, নিখাদ অর্থনৈতিক মূল্যে পাখি যে কত দামী তা বুঝতেন তিনি, বুঝিয়ে গিয়েছেন আমাদের। ঝুলি ভর্তি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকলেও ঝুলি ভরে গেছিল সম্মানে। ১৯৫৩ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল কর্তৃক প্রদত্ত জয় গোবিন্দ গোল্ড মেডেল লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে দিল্লি ইউনিভার্সিটি এবং ১৯৭৮ সালে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটিও তাঁকে একই সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৬৭ সালে তিনিই হন প্রথম অব্রিটিশ মানুষ, যিনি ব্রিটিশ অর্নিথলজিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গোল্ড মেডেল লাভ করেন। সেই বছরই তিনি জ্য পল ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ডলারের পুরস্কার পান, যা তিনি নিজের নামের একটি বার্ড কনজারভেশন ফান্ডকে দান করে দেন। ১৯৬৯ সালে তিনি জন সি ফিলিম মেমোরিয়াল মডেল পান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড নেচার রিসোর্সের পক্ষ থেকে। ইউএসএসআর অ্যাক্যাডেমি অফ মেডিক্যাল সায়েন্স তাঁকে প্যাভলস্কি সেন্টিনারি মেমোরিয়াল মেডেলে ভূষিত করে। সেই বছরই তিনি কমান্ডার অফ নেদারল্যান্ডস সম্মানে ভূষিত হন, সেই দেশের যুবরাজ বার্নার্ডের দ্বারা। ভারত সরকার তাকে হাজার ১৯৫৮ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৭৬ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত

করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি রাজ্যসভার সাম্মানিক সদস্য রূপেও মনোনীত হন।



সালিম মূলত উইভার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। লেখালেখির কাজ করার জন্য তিনি বেছে নেন তাঁর শ্বশুরবাড়িকেই। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল মুম্বইয়ের একটি ছোট্ট গ্রাম কিহিমে। গাছপালায় ঢাকা শান্ত পরিবেশের সেই গ্রামে একমনে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন সালিম। ১৯৩০ সালে তিনি প্রকাশ করেন উইভার গোত্রের পাখিদের বৈশিষ্ট্য এবং কার্য পদ্ধতি নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম আর্টিকেল। এই আর্টিকেল তাঁকে পক্ষীবিশারদ মহলে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে জায়গা করে দেয়। এই সময়ের পর থেকেই সালিম ঘরে বসে গবেষণার বদলে সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে পাখিদের সম্পর্কে সার্ভে এবং বিশদ গবেষণা চালাতে শুরু করেন। দশ বছরের দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত 'দ্য বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস।' এরপরে তিনি অপর এক বিখ্যাত পক্ষীবিদ এস ডিলন রিপ্লের সঙ্গে যৌথভাবে ১০ খণ্ডের

'হ্যান্ডবুক অফ দ্য বার্ডস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' প্রকাশ করেন। যেটা করতে তিনি প্রায় ১০ বছর সময় নিয়েছিলেন। এখানে তিনি আরও গভীরভাবে উপমহাদেশীয় পাখিদের গঠন, চালচলন, বাসস্থান, প্রজনন, পরিগমন ইত্যাদি নানান ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'কমন বার্ডস' এবং ১৯৮৫ সালে লেখা তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য ফল অফ স্প্যারো।'

সালিম আলি পক্ষী পর্যবেক্ষণের কৌশল ছিল মুঘল সম্রাট বাবর এবং জাহাঙ্গিরের মতোই - দ্রুত ধারণা তৈরি করা কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ বজায় রাখা। যেকোনও শাখার একনিষ্ঠ গবেষক সেই শাখার গভীরতা বুঝতে তার ইতিহাস পাঠ করেন নিবিড়ভাবে নিজের উপলব্ধি পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের কাছে। সালিম আলি ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখনী ও বিভিন্ন বক্তৃতার মঞ্চে। ষোড়শ আজাদ মেমোরিয়াল লেকচারে সালিম আলি তুলে আনলেন ভারতবর্ষের পক্ষী চর্চার ইতিহাস। মুঘল আমলের আগে পাখির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হলেও সেগুলি নির্ভরযোগ্য ছিল না। এ ব্যাপারে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চেষ্টা শুরু করেন বাবর। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সালিম বলছেন, "চালু ধারণাকে আশ্রয় করে পাখির বর্ণনা তৈরি করতেন সম্রাট বাবর একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, শীতকালে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মোনাল ফিজ্যান্ট নেমে আসে পাহাড়ের পাদদেশে পথে এদের দল যদি কোনও আঙুর ক্ষেতের

উপর দিয়ে যায়, তখন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে সেখানেই।” বাবর লিখেছেন, ”এইসব কথার সত্যতা ঈশ্বরই জানেন। আমি বুঝি যে এর মাংস বেশ সুস্বাদু। ‘ইতিউতি কথায় যে বাবরের আস্থা নেই এবং পক্ষীকুলের বর্ণনার যে সেগুলোকে কোনও স্থান দেননি, এটাই তার দৃষ্টান্ত। তবে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যিনি পাখি সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন নিবিড়ভাবে তিনি হলেন সম্রাট জাহাঙ্গির। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি যদি সম্রাট না হয়ে কোনও ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রধান হতেন, তাহলে হয়তো অনেক বেশি সুখী হতেন। এমনই ছিল তাঁর পক্ষীপ্রেম। রাজসভায় তিনি স্থান দিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর ওস্তাদ মনসুরকে। তাঁর কাজ ছিল নতুন পাখির ছবি আঁকা।

বিখ্যাত পক্ষীবিশারদ ছাড়াও তিনি ছিলেন এক বাইক পাগল মানুষ। তাঁর জীবনের প্রথম গাড়ি ছিল ৩.৫ এইচ পি এনএসইউ। পরবর্তীকালে একটি সানবিম এবং তিনটি আলাদা আলাদা মডেলের হার্লে ডেভিডসন, একটি ডগলাস, একটি স্কট একটি নিউহাডসন এবং একটি জেনিথ তাই বাইকের সংগ্রহশালাকে শোভান্বিত করেছিল।

১৯৭০ সালের ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে কোয়েম্বাটুরে সালিম আলি সেন্টার ফর অর্নিথলজি অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটিতে স্থাপন করা হয় সালিম আলি স্কুল অফ ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। গোয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করেন সালিম আলিবার্ড স্যাংচুয়ারি এবং এবং কেরালাতে

ভেম্বানাদের কাছাকাছি এক জায়গায় তাঁর সম্মানে সূচনা ঘটে থাট্টাকাড বার্ড স্যাংচুয়ারি। ১৯৭২ সালে কিট্টি থংলঙ্গা একটি বিরল প্রজাতির বাদুড়ের স্পিসিজ আবিষ্কার করেন যার নাম রাখা হয় Latidens salimalii. এছাড়াও রক বুস কোয়েলের একটি সাব স্পিসিসকেও তাঁর নামেই Perdicula argoondah salimalii পরিচিতি দেওয়া হয়। এছাড়াও ফিন-এর উইভারের একটি প্রাচ্যীয় সাব স্পিসিসকেও নাম রাখা হয় তাঁরই নামে Ploceus megarhynchus salimalii. ব্ল্যাক-রাম্পড ফ্লেম ব্যাক উডপেকারের একটি সাব স্পিসিসকে নাম রাখা হয় তাঁর স্ত্রীর নামে (তেহমিনা) Dinlopium benghalenese tehmainae.

১৯৮৭ সালের ২০ জুন প্রোস্টেট ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর ৯০ বছর বয়সে তিনি জীবনযুদ্ধে হার মানেন এবং আমাদের ছেড়ে অন্য জগতে পাড়ি দেন। এরকম মানুষের শুরু তো আছে, কিন্তু তার যেন শেষ নেই। তাঁর সম্পর্কে যতই বলা হোক না কেন, তা যেন কম পড়ে যায়।

ভারতের বার্ডম্যান সেলিম আলি। পাখি ও প্রকৃতিপ্রেমের বাইরে তাঁর খুব প্রিয় ছিল মোটরসাইকেল। এই নভেম্বরে তাঁর ১২৬-তম জন্মদিবস। আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

★ তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- (১) ডঃ মানস প্রতিম দাস, অনুষ্ঠান কার্যনির্বাহক, আকাশবাণী কলকাতা, আকাশবাণী ভবন, (২) বিজ্ঞান ডট ওআরজি ডট ইন, (৩) ঊর্মি নাথ, (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, (৫) বিজ্ঞান

পত্রিকা - কিছু ইতিহাস-কিছু বিজ্ঞান, ১৩ নভেম্বর ২০১৫, (৬) পক্ষীবিশারদ সালিম আলি - রেজা খান। (৭) ফেমাস সাইন্টিস্টস - সালিম আলি ১৮৯৬-১৯৮৭, (৮) ফল অফ স্প্যারো - সালিম আলি, (৯) দ্য বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস - সালিম আলি, (১০) দ্য হিন্দু - হাইড অ্যান্ড সিক উইথ সালিম আলি, ১১ নভেম্বর ২০১৭, (১২) ইন্ডিয়া টুডে - রিমেম্বারিং সালিম আলি : দ্য বার্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া, (১১) মাই সেপিক ডট কম ও (১৩) উইকিপিডিয়া।

★ পাখী সংক্রান্ত কয়েকটি সুন্দর ওয়েবসাইট :- Bird Count India, eBird, eBird India, Cornell Lab of Ornithology, Audubon Society.

"আমাকে যদি আমার নিজের লোকদের থেকে সুরক্ষার জন্য নিজের দেশে পুলিশী নিরাপত্তা নিতে হয়, তবে আমার মধ্যে কিছু গন্ডগোল আছে, আমি ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে লড়াই করছি এবং সেটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, বরং এই লড়াই সবার জন্য।"

- নরেন্দ্র দাভেলকার

টিকে থাকার লড়াইয়ে ‘ধর্মগুলো সব রূপকথা’

লি খে ছে ন - জা হি দ রু দ্র



সম্প্রতি একটা বিষয় লক্ষ্য করছি, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কোরানের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত রয়েছেন ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে। সত্যজিৎ রায়ের মহাপুরুষ ছবিটিতে দেখেছিলাম পদার্থ বিজ্ঞানে পিএইচডি করা এক ভদ্রলোক “ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ” এর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। ওই

ভদ্রলোকের বিশ্বাস ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব দেখতে পারেন।

মহাপুরুষটি দার্শনিক সক্রেটিসের সাথে গ্রিসের এথেন্সে আড্ডা দিয়েছেন তাও আড়াই হাজার বছর আগে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ছিলেন। ব্যাবিলনের বাজার থেকে তাঁর বর্তমানব সেবক (রবিঘোষ)-কে পেয়েছেন। ১৯৬৫ সালে নির্মিত ছবিটি রাজশেখর বসু (পশুরাম) এর ছোটগল্প বিরিঞ্চিবাবা অবলম্বনে তৈরী। ছবিটিতে ওই মহাপুরুষের প্রচুর ভক্ত ছিল কলকাতা শহরে। তারা সকলেই শিক্ষিত, বড় অ্যাকাডেমিক এবং সমাজের উঁচু মাথা কিন্তু যুক্তি বিবেচনার অভাবে ভোগেন। রাজশেখর বসু গল্পটি লিখেছেন শত বছর আগে। আজ শত বছর পর সেই মহাপুরুষেরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ধর্মগ্রন্থীয় ব্যাখ্যা দিয়ে রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়েছেন।

“Science without religion is lame, religion without science is blind.” অর্থাৎ “বিজ্ঞান ধর্ম ছাড়া খোঁড়া, ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ।” এই বাক্য বহু বছর অন্ধের মতো ব্যবহার করেছে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা প্রমানের জন্য। এই বাক্যটাকে তারা বিখ্যাত করেছেই তাদের ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমানের প্রয়োজনে। কালক্রমে এই বাক্য হাতবদল হয়ে সেটা এখন উপমহাদেশের ধর্মান্ধদের হাতে পড়েছে।

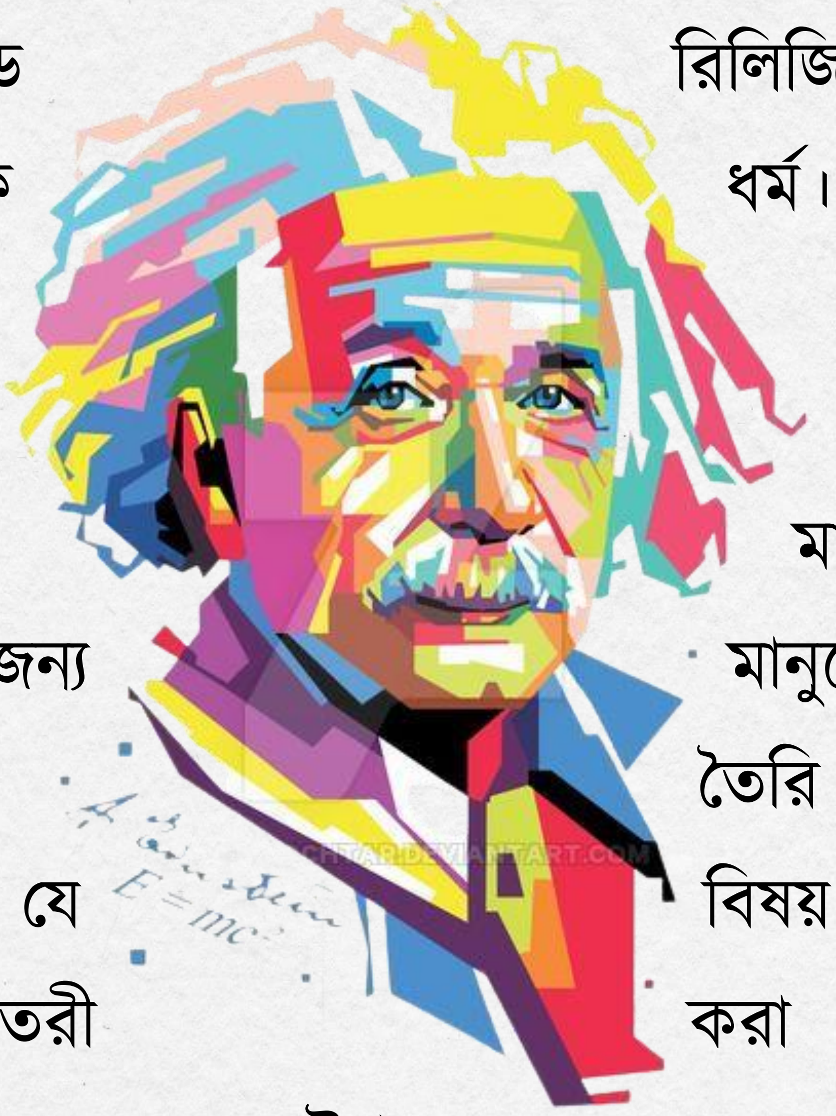
আর্লবার্ট আইনস্টাইন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা দিতেন। শিক্ষার্থীরা তাকে নানাধরণের প্রশ্নে জর্জরিত করতো। সবচেয়ে যে প্রশ্নগুলো বেশি করা হতো তার একটি হল, ভবিষ্যতে কী আছে? জবাবে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আইনস্টাইন বলতেন, ‘ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তা করি না মোটেও। কারণ, এটা এমনিতেও তাড়াতাড়িই আসে।' আইনস্টাইনকে আরও একটি সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত তা হল, “আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?” উত্তরে আইনস্টাইন সর্বদা একই উত্তর দিতেন, “বাইবেলের ঈশ্বর নয় বরং আমি স্পিনোজার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।” বারুচ ডি স্পিনোজা ছিলেন একজন ডাচ দার্শনিক। দেকার্তের সাথে সপ্তদশ শতাব্দীতে দর্শনের অন্যতম দুর্দান্ত যুক্তিবাদী হিসাবে বিবেচিত হতেন স্পিনোজা। স্পিনোজার ঈশ্বর বলতেন, প্রার্থনা বন্ধ কর। পৃথিবীর পথে বেরিয়ে এসো। তোমার জীবন উপভোগ কর। আমি চাই তুমি নাচ, গাও, আনন্দ কর, মজা কর। আমি তোমার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার পুরোটা উপভোগ কর।

আমার এক বন্ধু ফিজিক্সে মাস্টার্স করছে তার অভিমত, পৃথিবী সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে এটা কখনোই বিশ্বাস করা যাবে না। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য এসব পড়তে হবে মাত্র। তার কথায় আরও অবাক হই যখন তার এক

পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কথা সে বলে। সোসিওলজিতে পিএইচডি, তিনি বিশ্বাস করেন তার স্ত্রীর উপর জ্বীনের আছর আছে, স্ত্রীকে মনোচিকিৎসকের কাছে না নিয়ে তিনি হুজুরের পানি পড়া, তেল পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন মানব দেহের হাড় গবেষণা করে আরবি হরফের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্ত হল – "Development of Co-relation Between Interdisciplinary Science and Religion" (আন্তঃবিভাগীয় বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সহ-সম্পর্কের বিকাশ)। তাঁর মতে মানুষের কঙ্কালের গঠন কোরান তত্বের উপর ভিত্তি করেই গঠিত। সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা উনি তার পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন জাপান থেকে।'

মানুষের মনে ধর্মবোধ কী করে জাগ্রত হল এই বিষয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম কারণ হল ভয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি, হিংস্র পশুদের আক্রমণ ইত্যাদি বিপত্তির কারণে মানুষ অসহায় বোধ করে, ভয় পায়। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মানুষ বড় পাহাড়, বড় গাছ, সূর্য, চন্দ্র কে ঈশ্বর মেনে সন্তুষ্টি লাভের জন্য বন্দনা শুরু করে। মনে করে এইসব নিয়ন্ত্রণ করছে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি। তাকে খুশি করতে পারলে বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

পরবর্তীতে সেই অদৃশ্য শক্তির নাম ঈশ্বর, গড বা আল্লাহ বা জিহোভা। তাকে স্তুতির জন্য তৈরি হয় অর্গানাইজড রিলিজিওন বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ সমাজে ন্যায়নীতির একটা মানদণ্ড তৈরি করার জন্য মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ তৈরি হয়। তৃতীয় কারণ, যে বিষয় সম্পর্কে যুক্তি তৈরী করা যায় না সেগুলোকে ঈশ্বরের অলৌকিকত্ব হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এই অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। এই অন্ধবিশ্বাসের মূলে একে একে আঘাত করে দার্শনিক বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞান ভয়ের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়।



আবার বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্য পড়া একজন মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ায় ধর্ম-অবিশ্বাসী হতে পারেন। অন্যদিকে পদার্থ বা রসায়ন বিজ্ঞান পড়া একজন মানুষ শুধু বিজ্ঞান-মনস্ক না হওয়ায় ধর্ম-বিশ্বাসী হতে পারেন। এবার চলুন দেখি সাহিত্যে কিভাবে ধর্মীয় প্রচার কাজ করছে। কিছু দিন থেকে সামাজিক মাধ্যমে এসে থাকা ইংরেজি ভাষায় A for Apple, এর বিপরীতে A for

Arjuna,. B for Balaram, C for Chanakya, D for Dhruva, E for Eklavya দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। ভুল বললে ক্ষমা করবেন।

এই কনসেপ্ট যিনি নিয়ে এসেছেন হয়তো ভুলে গেছেন যে A ইংরেজি বর্ণমালার একটা শব্দ এবং A দিয়ে শুধু ইংরেজি শব্দ চর্চাই মূলত পড়ুয়াদের জন্য দরকারি। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ভাষা আয়ত্বের জন্য ইংরেজি শব্দভাণ্ডার জানা একান্ত জরুরি। তাই A for Apple, B for Ball, C for Cat, D for Dog জানা আমাদের শিশুদের জন্য প্রয়োজন। আচ্ছা মনে করেন যদি বাংলায় অজগর, আম, ইঁদুর, ঈগল এর পরিবর্তে অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করি তবে কি নিজের ভাষা জানার কোনও উপায় থাকবে?

ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও যে ধর্ম হতে পারে, যেমন বৌদ্ধ ধর্ম, আবার ধর্মকে বাদ দিয়েও ঈশ্বর হতে পারে। যেমন স্পিনোজার ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের বন্দনা হয় না। অনুভব করা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের নিভৃত প্রাণের দেবতা। বিস্ময়ে ভয় নয় -- জাগে প্রাণ। সৃষ্টি হয় আনন্দ। ভালোবাসা। প্রেম। যে ফুলটি ফোটে--মনে হয় ফুলটি আমি। যে শিশুটি টলোমলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায়, কেঁদে ওঠে, আবার উঠে পড়ে -- হেসে ওঠে, মনে হয় এই শিশুটিও আমি। আর শিশুটির মা বলে উঠছে--

আহা বাছা। সেই মাও আমি। ওর বাবা মানুষটিও আমি। আকাশের তারাটিও আমি। আমিই সকল কিছু। আমিই সে। সে-ই আমি।

এই আমি তাহলে হলো প্রাকৃতিক সুশৃঙ্খলা মাত্র। একেই স্পিনোজা বলেছেন ঈশ্বর। আইনস্টাইন এই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। এই ঈশ্বর কাউকে উদ্বিগ্ন করে না। ভয় দেখায় না। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ধর্ম আর ধর্মীয়গ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়ে, বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-আয়শারা ধর্মের সাথে প্রতিটা বিভাগের রিলেশন। দেশে ধর্ম ও বিজ্ঞানে আদানকারী মানুষে ভরে গেছে কিন্তু সমাজ সংস্কারে আমাদের দরকার সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তাই খুব সংযত ও যুক্তিসংগত ভাবে অটল বিশ্বাসী কুপমূন্ডকগণদের ‘সব ধর্মই ক্ষতিকর এবং অসত্য’ বোঝাতে হবে।

কেন এদেশে হিন্দুরা বিপদে?

লিখেছেন - রাহুল রায়



আমরা প্রায়ই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে একটি অভিযোগ পাই যে বিরোধী দল বা দলের নেতারা রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেশাচ্ছেন। এই দুইয়ের মিশ্রণে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। পরবর্তীতে অবশ্য এই নেতাদেরই মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় দেখা যায়। একাংশকে তো আবার এর মধ্যে সবগুলোতেই দেখা যায়, তাও আবার ভঙ্গিমা বদল করে প্রার্থনারত অবস্থায়। অন্যের ক্ষেত্রে যত নিন্দাই করুক না কেন নিজের বেলায় গর্হিত এই কাজকে তখন দিব্যি জনসংযোগ বলে এঁরা চালিয়ে দেন। যে যাই বলুন না কেন বাস্তবে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক এদেশে আদি

কাল থেকে চলে আসছে। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ও পতন থেকে শুরু করে মোঘল, ব্রিটিশ পর্ব পরিষ্কার বলে দেয় যে এখানে ধর্ম ও রাজনীতি ওতপ্রোত ভাবে একে ওপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই দুইয়ের কাণ্ডারীদের কাজ করার ধরণেও দারুণ মিল আছে। ধর্মের অভিভাবকরা যাদের আমরা পুরোহিত বলে চিনে থাকি, সাধারণ মানুষকে বশে রাখতে কখনো স্বর্গের লোভনীয় স্বপ্ন দেখান তো কখনও নরকের ভয় দেখান। আবার রাজনৈতিক নেতাদেরও দেখা যায় মানুষকে পাশে রাখতে একই কাজ করেন। কখনও প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেন তো কখনো মারাত্মক শাস্তির ভয় দেখান। অর্থাৎ লোভ আর ভয়ের অস্ত্রেই এই দুই পক্ষ নিজেদের মত করে ব্যবহার করে নিজেদের কাজ হাসিল করেন।



আজকের দিনের নিরিখে দেখতে গেলে 'আচ্ছে দিন', 'অমৃত কাল', ‘রামরাজ্য’কে সেদিক থেকে জনগণকে পাশে রাখতে দেখানো 'স্বর্গীয় লোভ' বলতে হবে। পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন স্বর্গ নামক জায়গাটিকে দেখেনি, অথচ পুরোহিতরা যুগ যুগ ধরে সেই কল্পনা থেকেও নাকি সুন্দর জায়গার টোপ দিয়েই যাচ্ছেন। ‘ধর্মের পথের’ পথিক হলে পুরোহিতদের আশীর্বাদে স্বর্গপ্রাপ্তি অবধারিত। স্বর্গের অবস্থান, আকার, অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর আসছে যে যেহেতু মৃত্যুর পরই সেখানে মানুষ যেতে পারে তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বর্গকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। অতীতে পুরোহিতরা ‘বিশেষ ক্ষমতাবলে’ সেই জায়গা সম্পর্কে জেনেছেন এবং সেই জ্ঞানই স্বর্গের ধারণার মূল। এই ধারণা সকল প্রশ্নের উর্দ্ধে। আজকের রাজনৈতিক কাণ্ডারীরা একই রকম। ‘আচ্ছে দিন’ এর সংজ্ঞা, ‘অমৃতকাল’ এর অর্থ বা ‘রামরাজ্যের’ ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করলেই উত্তর আসে না। তার বদলে উঠে আছে একগাদা অভিযোগ, অনেকটাই স্বর্গ নিয়ে প্রশ্ন করলে পুরোহিতের উত্তরের মতো। সেখানে প্রশ্নের উত্তর আসে না, উল্টে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন আসে এবং সর্বোপরি অবিশ্বাসী বা নাস্তিক নামকরণ হয়।

রাষ্ট্র পরিচালকরা কিছু দিন পর পর তাদের পরিচালিত ব্যবস্থাকে বিভিন্ন নাম দিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। আবার তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুচ্ছকেও একই ভাবে তারা নামকরণ করে থাকেন। ‘আচ্ছে দিন’, ‘অমৃতকাল’,

‘রামরাজ্য’ এগুলো সেরকমই নামকরণ। ‘রামরাজ্যে’র উল্লেখ সর্বাগ্রে এদেশের মানুষ মহাত্মা গান্ধীর কাছে পেয়েছিলেন। গান্ধী সুশাসনকে রামরাজ্য আখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সুশাসনের সংজ্ঞা তিনি দিয়ে যাননি। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো বাস্তববাদী তিনি অবশ্য কোনোদিনই ছিলেন না। সেদিক থেকে বিচার করলে 'রামরাজ্য' নিয়ে তাঁর নিজের ধারণাই বা কতটুকু পরিষ্কার ছিল তা নিয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকেই যায়। যাই হোক মহাত্মা গান্ধীর সেই রামরাজ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, সামাজিক অবস্থা কি রকম হবে তা নিয়ে আমাদের কিছুই জানা নেই। এমনকি যার থেকে এর সৃষ্টি সেই কাব্যগ্রন্থ রামায়ণে উল্লেখিত রামচন্দ্রের রাজ্যই বা কিরকম পরিচালিত হতো তারও বিশদ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সেদিক থেকে একান্তই ধর্মীয় আবেগ পরিচালিত এবং একই সঙ্গে চরম ধোঁয়াশাপূর্ণ। এদিকে স্বাধীনতা লাভের পর ৭৫-টি বসন্ত পার হয়ে গেছে। শাসক দলের কাছে কিছুদিন পর পর ‘বিশ্বগুরু’ হওয়ার কথা শোনা যায়। সেটা স্বাভাবিক, নিজের ঢাক পেটাতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের অবস্থা কোথায়? ৭৫-বছরে কতটুকু আমরা এগোতে পেরেছি। এই বছর বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর তৈরি সুচিতে ভারতের অবস্থান নিম্নরূপ –

বিষয় সূচক	ভারতের অবস্থান
উদ্ভাবনী সূচক	৪০
পরিবেশরক্ষা সূচক	১৮০
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক	১৫০
গণতন্ত্র সূচক	৪৬
দুর্নীতি সূচক	85
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সূচক	৬৬
উৎকোচ সূচক	৮২
খাদ্য সুরক্ষা সূচক	৭১
অবসরকালীন ভাতা সূচক	৪০
ক্ষুধা সূচক	১০৭
যুব উন্নয়ন সূচক	১২২
শান্তি সূচক	১৩৫
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক	১২১
মানব স্বাধীনতা সূচক	১৩১
মানবসম্পদ সূচক	১১৬
অসাম্য সূচক	১৪৭
শিশু অধিকার সূচক	১১৭

দেশ যে এগোচ্ছে না এই কথা দেশের চরম শত্রুও বলতে পারবে না। ‘সাপ খেলানো মানুষের দেশ’ আজ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির অধিকারী। শিক্ষার হার, গড় আয়ু গত সাড়ে সাত দশকে অনেকটাই বেড়েছে। আজ পৃথিবীর অন্যতম ধনী দুই জন ব্যক্তি এই দেশেরই মানুষ। তথ্যপ্রযুক্তি, মহাকাশচর্চায় এদেশের উন্নতি রীতিমতো ঈর্ষনীয়। কিন্তু এই চোখ ধাঁধানো উন্নতির পেছনের অন্ধকারটা অত্যন্ত গাঢ়। এদেশে পৃথিবীর

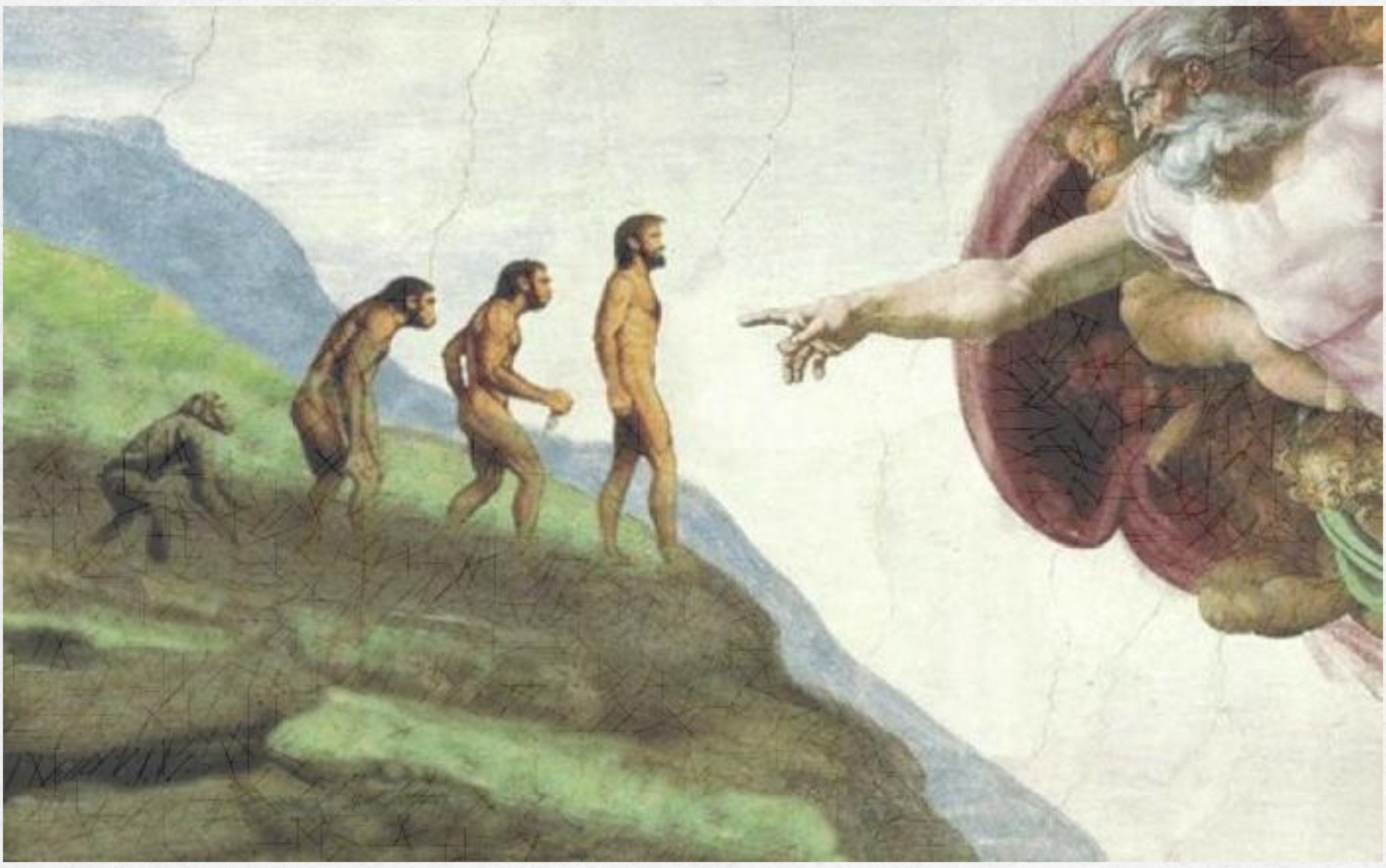
সবচেয়ে বেশি অভুক্ত, অশিক্ষিত মানুষ থাকেন। এদেশে স্কুল ড্রপ আউটের হিসাব আফ্রিকার দেশগুলোকেও পেছনে ফেলে দেয়। এদেশ আজও বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। শিশুশ্রমিকের সংখ্যায় আমরা সবচেয়ে উপরে আছি। এখানে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিলেও ধর্মীয় তাবেদারদের সৌজন্যেও আজ মাটির প্রতিমাতে প্রণাম করার জন্য রক্তমাংসের মানুষকে মরতে হয়। ধর্মীয় হানাহানির মধ্যে দিয়ে এদেশে রাজনীতি পরিচালিত হয়। যুবপ্রজন্মের জয়গান এদেশে সারাদিন নেতাদের মুখে থাকলেও এদের অশিক্ষা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে। এখানে ছেলেমেয়েদের হাতে শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া না হলেও ধর্মের বা বর্ণের ধ্বজা কিন্তু সময় মতো দিয়ে দেওয়া হয়। শাসকদের স্বার্থরক্ষা বলে কথা। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এই তালিকা দীর্ঘ, সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রাপ্তির সোনালী থলিটা যেদিকে গেছে সেদিকে মানুষ জনসংখ্যার নিরিখে অত্যন্ত কম বললেও কম বলা হবে আর অপ্রাপ্তির শতছিদ্র থলিটা যেদিকে রয়েছে সেদিকে মানুষ গুণে শেষ করাটা অসহনীয় হবে।

ইতিহাস বলে যুগ যুগ থেকে পুরোহিতবর্গ ও শাসনে থাকা কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে ভয় আর লোভের অস্ত্রে পরাভূত করে রেখেছে। হাস্যকর হলেও

সত্যিটা হল এই অলীক লোভ ও ভয় কাটিয়ে উঠে মানুষ খুব কম বারই এই অত্যাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতে পেরেছে। সাধারণত, সে ধর্মের মোড়কে বাঁধা এই কল্পনাকে কাঁধে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। দেশের বর্তমান শাসকরাও একই পথের পথিক হয়েছে। নিজেদের বিফলতা ঢাকতে কখনো দান তো কখনও শাস্তির অস্ত্র ব্যবহার করেন। এদিকে চলে নিজেদের কাজের রাতদিন প্রচার আর আগাম দিনের জন্য মানুষের মধ্যে স্বপ্নের ফুলঝুরি ছড়ানো। পরিশেষে পরিবেশিত হয় অতি পরিচিত কিন্তু মোক্ষম অস্ত্র-বিদ্বেষাস্ত্র। নির্বাচন আসলেই শোনা যায় - হিন্দুরা বিপদে আছে (হিন্দু খতরে মে হে)। এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখলেই হিন্দুরা রক্ষা পাবে। বাস্তবটা হলো হিন্দুরা বিপদেই আছে। ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা আলাদা হলেও শ্রেণীগত দিক দিয়ে দেশের ৮০% মেহনতী জনগণের সমস্যাগুলো কিন্তু এক - বেকারত্বের জ্বালায় সকলেই জ্বলছে; চাহিদাও এক - নিরাপদ বর্তমান, সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও শান্তি সমৃদ্ধিতে সবার বাঁচা চাই, যেখানে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যেভাবে দেশে একের পর এক সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, দেশের মানুষ প্রশ্ন ও যুক্তিহীন হচ্ছেন তাতে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কিন্তু সর্বাবস্থাতেই – 'খতরে মে হে'।

বিশ্বাস ও বিজ্ঞান এক নয়

লিখেছেন – মুজিব রহমান



আদম ও হাওয়ার গন্ধম খাওয়া নিয়ে তাদের কথোপকথনের কথা বলছিলাম ধর্ম পড়াতে গিয়ে। এক ছাত্রী বলল, 'স্যার গতকাল আপনি সমাজ পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আদিম মানুষ কথা বলতে পারতো না', আজ ধর্ম পড়াতে গিয়ে বলছেন, 'আদম হাওয়া কথা বলছে'। আমি শুধু বলেছিলাম, ধর্ম পড়ার সময় বিশ্বাস নিয়ে পড়বে আর বিজ্ঞান পড়ার সময় যুক্তি-প্রমাণসহ পড়বে।

বাংলায় শব্দদুটির মধ্যে অনেক মিল। দুটোই ‘বি’ দিয়ে শুরু এর পর একটি যুক্তাক্ষর সাথে ‘আ’ কার এবং শেষে একটি অক্ষর। অথচ এরা বিপরীত মেরুর। নিউটন ও আইনস্টাইনের কোন সূত্রে বিশ্বাস স্থাপন করার সুযোগ নেই। প্রমাণ ছাড়া সূত্র টিকবে না। যখনই ভুল প্রমাণ হবে সাথে সাথেই বাতিল। অনেকেই ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞান মিলাচ্ছেন। অনেকে বলেন- বিশ্বাস ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ! তারা না জেনে, না বুঝেই অথবা প্রতারণামূলকভাবে এসব বলছেন। মাত্র তিনটি পার্থক্য তুলে ধরছি -

১। বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, পৃথিবী গোলাকার। চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে আর পৃথিবী-চন্দ্র মিলে সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়। মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে যা সম্প্রসারণশীল। ধর্মগ্রন্থে বলা হচ্ছে, পৃথিবী সমতল। স্থলভাগের পরে রয়েছে অফুরন্ত জলরাশি। সকালে ফেরেস্তারা সূর্যকে টেনে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিমে টেনে নিয়ে যায়। কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যায়। রাতে সূর্য আরশের নিচে বসে জিকির করে। চন্দ্র ও সূর্যের জন্য নির্দিষ্ট পথ করা হয়েছে যাতে একটি আরেকটিকে অতিক্রম করতে না পারে। তারকামণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছে আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য।

২। বিজ্ঞানে এখন বলা হয়েছে, সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। ‘বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান মানুষের প্রজাতি তিন লক্ষ বছর আগে এসেছে। বাইবেল

বিশ্লেষণ করে, পাদ্রিরা বলছেন, যিশুর জন্মের ৪ হাজার বছর আগে ঈশ্বর এডাম ও ইভকে তৈরি করেছেন। অন্য ধর্মে বিভিন্ন নবী ও ধর্মপ্রচারকদের আয়ুষ্কাল বিশ্লেষণ করে কাছাকাছি পৌঁছানো গেলেও হিসাব মেলানো যায় না। ছয় দিনে মহাবিশ্ব, পৃথিবী, গাছ-পালা, পশু-পাখি ও মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

৩। বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, মানুষ কোষ দ্বারা তৈরি। কোষের সম্মিলিত শক্তিই তাকে চালিত করে। শরীরে আত্মা, রুহু বলতে কিছু নেই। ধর্মগ্রন্থগুলো বলছে, ঈশ্বর আত্মা বা রুহু সৃষ্টি করে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। আত্মা বা রুহু অবিনশ্বর। মৃত্যু মানে শরীর থেকে রুহু বা আত্মা বের হয়ে যাওয়া। শরীর মাটি দিয়ে তৈরি।

যার ধর্ম তার তার কাছে, বিশ্বাসও যার যার তার তার। অসুবিধা কি? চলুক। কিন্তু দুটোকেই এক করতে গেলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। যারা লেখাপড়া শিখে একটু সচেতন হবেন, যারা বিজ্ঞান বুঝবেন তাদেরকে যখন বলবেন ধর্মগ্রন্থ থেকেই বিজ্ঞান গ্রন্থের উৎপত্তি হয়েছে আর বিশ্বাসই বিজ্ঞান তখন সে লোক কিন্তু ঠিকই বুঝে ফেলবে। আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করবে।

বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক রয়েছে? বাস্তবিক কোন সম্পর্ক থাকার সুযোগ নেই। দুটি দুই মেরুর। একটির বিপরীতে আরেকটি। বিজ্ঞান সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ আর বিশ্বাস অলৌকিকতা নির্ভর। একজন যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ বিশ্বাস নির্ভর হয়

না। তাহলে মানুষ কেন বিজ্ঞানমনস্ক হয় না? জন্মের পরেই মানুষ মুক্ত না হয়ে পারিবারিক ফাঁদে পড়ে যায়। যে পরিবারে যার জন্ম সে ওই পরিবারের ভাবাদর্শেই বড় হয়। সাধারণত একজন হিন্দুর সন্তান ধারাবাহিকভাবেই হিন্দু থাকে, মুসলিমের সন্তান ধারাবাহিকভাবে মুসলিম থাকে। পরিবার থেকে তারা শিখে - এগুলোই সত্য, সঠিক এবং এগুলো অবিশ্বাস করা মহা অপরাধ। পরিবার থেকে বেরিয়ে সে একই ধরনের সমাজে মিশে। সেই সমাজেও সে একই শিক্ষা পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার পরিবার ও সমাজ থেকে অর্জিত অন্ধবিশ্বাসকেই লালন করতে শেখায়। দরিদ্র দেশের মানুষ বের হতে পারে না, তারা মুক্তচিন্তা করতে শিখে না।

বিজ্ঞান থেকে আমরা কি শিখি? অজানাকে জানা ও রহস্যকে উন্মোচন করা। বিশ্বাস থেকে আমরা শিখি উল্টোটা অর্থাৎ অজানাকে রহস্য দিয়ে ঢেকে রাখা আর রহস্যকে অলৌকিকতা দান করা। বিজ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের বিরোধ এমনই। একটিতে আসক্তি আসলে অন্যটি দূরে চলে যাবে, একটি বুঁদ হয়ে থাকলে অন্যটি হারিয়ে যাবে। যুক্তিবোধ প্রাধান্য পেলে বিশ্বাস হালকা হয়ে যাবে। আবার বিশ্বাসবোধ প্রাধান্য পেলে যুক্তিবোধও হালকা হয়ে যাবে। দুটো একসাথে বাস করে না।

আজাদি-কা অমৃত্ মহোৎসব! এবং আম্বেদকার

লি খে ছে ন - কি নো ক্ষ্যা পা



প্রথম দৃশ্য – স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে দেশব্যাপী সাজো সাজো রব, পালিত হচ্ছে ‘আজাদি-কা অমৃত্ মহোৎসব’, বড় বড় ব্যানার, যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি যদিও ঢেকে গিয়েছে ৫৬-ইঞ্চি ছাতির আড়ালে। দ্বিতীয় দৃশ্য – নয় বছরের ছেলে ইন্দ্র-র শেষকৃত্য করছে তার বাবা; ইন্দ্র-র স্কুলের শিক্ষক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে; ইন্দ্র-র অপরাধ ছিল সে জাতিতে

নিচু হয়েও উঁচু জাতির শিক্ষকের জন্য রাখা জলের পাত্র ছুঁয়ে ফেলেছিল। ২০২২ সালের আগস্ট মাসের মন্তাজ্‌টা কিছুটা এইরকম। যখন জাতি-বৈষম্যের নির্মম শিকার হতে হয় সুরেখা ভোতমাঙ্গেদের, সাগর শেজওয়ালদের, কিংবা ইন্দ্রদের তখন একবিংশ শতক নিজের সমস্ত অত্যাধুনিকতাকে পাশে বসিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এই অভাগা দেশে 'গরু' হয়ে জন্মালেও হয়তো তাঁদের প্রাণরক্ষা হতো। কিন্তু এই মানুষগুলোর অপরাধ হলো তাঁদের জন্ম নিচু জাতের পরিবারে, যে পরিবার বংশপরম্পরায় এই জাতিগত নিপীড়ন বহন করে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। তাঁদের অপরাধ হলো তাঁরা 'অবর্ণ', তাঁদের স্পর্শ করতে নেই; এমনকি তাঁদের ছায়াও মাড়াতে নেই; দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় রাতের অন্ধকারের, যাতে তাঁরা নিজেদের ছায়া সমেত অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পারেন এবং উঁচুজাতির মানুষরাও নিজেদের শুচিতা রক্ষা করতে পারেন। ব্রাক্ষ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র – এই চার বর্ণের মধ্যে ঠাঁই পাওয়ার সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। আর সৌভাগ্য হলেও তাঁদের সামাজিক অবস্থা নির্ভর করতো তাঁদের বর্ণের উপর। ব্রক্ষ্মার 'পা' থেকে উৎপন্ন হলে তার আবার কিসের অধিকার! তার একটাই কাজ ব্রক্ষ্মার 'মুখ', 'বাহু' ও 'উরু' থেকে উৎপন্ন হওয়া ব্রাক্ষ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদের সেবা করা। আর এই স্তরবিন্যাস এতটাই ছোঁয়াচে যে এক শূদ্র আরেক শূদ্রের উপরেও নামিয়ে আনতে

পারেন জাতিগত নিপীড়ন, যদি তিনি অপেক্ষাকৃত উঁচুজাতির শূদ্র হন। সময়ের সাথে এই সামাজিক ব্যাধি কমা তো দূরের কথা, বরং দেখা যাচ্ছে রাজনীতির ছত্রছায়ায় এই ব্যাধি যেন প্রতিদিন আরও বেড়েই চলেছে। আসুন, কিছু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড্স ব্যুরো-র বার্ষিক প্রতিবেদন (২৯-এ অগাস্ট, ২০২২) অনুযায়ী এসসি ও এসটি-দের বিরুদ্ধে জাতিগত অপরাধ ২০২১ সালে যথাক্রমে ১.২% ও ৬.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। এসসি-দের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে আছে উত্তর প্রদেশ (২৫.৮২%), রাজস্থান (১৪.৭%), এবং মধ্য প্রদেশে (১৪.১%)। এসটি-দের ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে মধ্য প্রদেশ (২৯.৮%), রাজস্থান (২৪%), এবং ওড়িশা (৭.৬%)। নথিভুক্ত মোট অপরাধের মধ্যে মহিলাদের উপর নির্যাতনের সংখ্যাও যথেষ্ট উদ্বেগজনক; শুধুমাত্র ধর্ষণের শতকরা ভাগই হলো এসসি মহিলাদের ক্ষেত্রে ৭.৬৪% এবং এসটি মহিলাদের ১৫%। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ২০২১ সালের শেষ পর্যন্ত এসসি ও এসটি-দের বিরুদ্ধে যথাক্রমে নৃশংসতার মোট ৭০,৮১৮ ও ১২,১৫৯-গুলো মামলা তখনও তদন্তের অপেক্ষায়, যার মধ্যে আগের বছরের মামলাও ছিল। সেই বছর এসসি ও এসটি-দের বিরুদ্ধে যথাক্রমে নৃশংসতার মোট ২,৬৩,৫১২ ও ৪২,৫১২-টা মামলা আদালতে বিচারের জন্য এসেছিল, যার মধ্যে ৯৬.০% ও ৯৫.৪% মামলা

বছরের শেষ পর্যন্ত বিচারাধীন অবস্থাতেই ছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধি-র (আইপিসি) সাথে 'এসসি ও এসটি (পিওএ) আইন'-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শতাংশ এসসি ও এসটি-দের জন্য যথাক্রমে ৩৬% ও ২৮.১%। বিগত বছরগুলোর প্রতিবেদনের দিকে তাকালেও খুব একটা আলাদা কিছু চোখে পড়বে না। সেই একই রাজ্যের নাম, ধর্ষণ-সহ অন্যান্য নৃশংস অপরাধের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, তদন্তের অনীহা, ন্যায়বিচারের অভাব, শাস্তি প্রদানের বদলে অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস বা জামিনে মুক্তি – এই প্যাটার্নটাই খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এই পরিসংখ্যানের সবটাই নথিভুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে। গণতন্ত্র বা গণমাধ্যম কোনোটাই তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণী-গন্ডি ভেঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে পৌঁছাতে পারেনি, এখনও। তাই এত বড় দেশের কোন অংশে কোন অঘটন যে জাতপাতের নামে ঘটে চলেছে তার হদিশ মেলা দুষ্কর। গড় হিসাবে প্রতিদিন প্রায় ৪ জন করে দলিত মহিলা ধর্ষিতা হয়ে চলেছেন। যে 'নির্ভয়া' কান্ড নিয়ে সারা দেশ তোলপার হয়েছিল, সেই বছরই সারা দেশে নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী ১৫৭৪ জন দলিত মহিলা ধর্ষিতা ও ৬৫১ জন খুন হয়েছিলেন।

তবে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে পরিস্থিতির গভীরতা নির্ণয় সম্ভব নয়। অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে এসসি-এসটি-দের বিরুদ্ধে নৃশংসতার ঘটনা সচরাচর সংবাদমাধ্যমগুলোতে সম্প্রচারও করা হয় না, কারণ স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে

জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম সবকিছুই মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং, সেখানে দলিতদের উপর সামাজিক নিপীড়ন, দলিতদের বঞ্চনার কাহিনী সর্বসমক্ষে প্রচারিত হবে এমনটা ভাবাও বোধহয় অন্যায়। তাও ২০০৬ সালে মহারাষ্ট্রের খৈরলানজী গ্রামে সুরেখা ভোতমাঙ্গে-র গোটা পরিবারের নৃশংস হত্যার ঘটনা সবাইকে নাড়িয়ে দেয়; সংবাদমাধ্যমও কিছুটা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়।



সুরেখা ভোতমাঙ্গে ছিলেন একজন গরীব, দলিত মহিলা, জাতিতে ‘মাহার’, মহারাষ্ট্রের খৈরলানজি গ্রামে যেখানে পরিবারসমেত তিনি থাকতেন সেখানকার অন্যান্য জাতির নিরীখে যার স্থান অনেক নিচে। তাই বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা থেকে চাষের জল সবক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত থেকে জুটত বঞ্চনা, নিপীড়ন; যেগুলোর মাত্রা চরমে উঠলে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন সাহায্য চাইতে। কিন্তু নিচু জাত হয়ে সাহায্যের আবেদন! এতো সাহস হয় কিভাবে? তাই খেসারত দিতে হয় আত্মীয় পরিবারের এক সদস্যকে। আবার পুলিশ।

এবার কিছু গ্রেপ্তারী। অভিযুক্তেরা অবশ্য সাথেসাথেই জামিন পেয়ে মুক্ত। এইবার আর কোনো সময় নষ্ট নয়। শিক্ষা দেওয়ার পালা; যেমন রামচন্দ্র দিয়েছিলেন শম্বুককে! উন্মত্ত অভিযুক্তেরা দলবল সমেত (সকলেই উচ্চবর্ণের গ্রামবাসী) ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরেখা-র পরিবারের ওপর। সুরেখা, সুরেখা-র সতেরো বছরের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা, আর সুরেখা-র ছেলেদুটোকে টানতে টানতে উঠোনে বের করা হয়। ছেলেদের বলা হয় মা আর বোনকে সবার সামনে ধর্ষণ করতে। না শোনায় তাদের যৌনাঙ্গ থেঁতলে দিয়ে তাদের মেরে ফেলা হয়। সুরেখা ও প্রিয়াঙ্কাকে গণধর্ষণ করা হয়, এবং পিটিয়ে হত্যা করা হয়। শোনা যায় তাঁদের প্রাণহীন মৃতদেহের উপরও ধর্ষণ চলেছিল অনেকক্ষণ। দিনটা ২৯শে সেপ্টেম্বর, সাল ২০০৬। তার নয় বছর পরেই বা পরিস্থিতি কিরকম? ২০১৫ সালের ১৬ই মে – বাবাসাহেব আম্বেদকারকে নিয়ে বাঁধা একটি গানের রিংটোন তার মোবাইলে বেজে ওঠে বলে ২৩ বছর বয়সী দলিত যুবক সাগর শেজওয়াল-কে মারধর ও পরে তার শরীরের উপর দিয়ে বাইক চালিয়ে দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হলো তাকে। আরও সাত বছর পর তথাকথিত স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির কয়েকদিন আগে উঁচু জাতির শিক্ষকের জলের পাত্র ছুঁয়ে ফেলার ‘অপরাধ’-এ শিক্ষক পিটিয়ে খুন করে ফেললেন ৯ বছর বয়সী দলিত কিশোর ইন্দ্র-কে। ইন্দ্র-র লাশের উপর দিয়ে উদ্‌যাপিত হলো ‘আজাদি-কা অমৃত্‌ মহোৎসব’। আদৌ কোনো মাধ্যম

দিয়েই কি এই হাজার হাজার বছরের সামাজিক পচনের গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব?



পুকুর, পাতকূয়ো, পানীয় জল, জমি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির অধিকার থেকে আজও প্রত্যন্ত এলাকার দলিতরা বঞ্চিত। হরিয়ানার মত জায়গায়, যেখানে একদিকে বিশ্বায়নের রমরমা, সেরমই আরেকদিকে সে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে দলিত বরকে সমস্যায় পড়তে হয় যদি তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বছর কয়েক আগে হিসার জেলার দৌলতপুর গ্রামে এক ব্যক্তির হাত কেটে নেওয়া হয়। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি উঁচুজাতের কোনো এক জমিদারের জলাধার থেকে জল খাওয়ার ‘সাহস’ দেখিয়েছিলেন। উঁচুজাতের কোনো পরিবারের মেয়ের সাথে নিচুজাতের কোনো ছেলের ভাব-ভালোবাসা অচিরেই ছেলেটির ‘খুন’ ডেকে আনে, এবং এই সত্যটা এতটাই প্রতিষ্ঠিত যে অন্যান্য কোনো কারণে দলিত খুন হলেও সেটা আড়াল করতে একটা প্রেম-ভাব-ভালোবাসার মিথ্যা দৃষ্টিকোণ জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে সেই

খুনটা সমাজে 'স্বাভাবিক' বা 'বৈধ' বলে গণ্য হয়; যাকে বলে – Honor killing। আর এই সমস্ত কিছুই ঘটে পুলিশ-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে। পুলিশের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সেটাও নির্ধারণ করে দেবে সাহায্যপ্রার্থীর 'জাত'। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম কোনো অত্যাচারের ঘটনা নথিভুক্ত করতে গেলে বিরোধীপক্ষও একটা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে থাকে, এবং প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের বাধ্য করা হয় অভিযোগ প্রত্যাহার করতে। তাই "Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989" আইনটাও বড়ই হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষতঃ যেখানে আইন-রক্ষক ও ন্যায়দাতাদের মধ্যে থেকেই এই স্বৈরাচারী বর্ণচেতনা এতদিনেও দূর করা যায়নি। উল্টে তাঁরা নিচুজাতিকে পদদলিত করে রাখতে নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষমতা অবলীলায় ব্যবহার করে থাকেন। অথচ, যে সামাজিক পার্থক্যকে ঘিরে এতকিছু, সেই সামাজিক পার্থক্য ও জাতপাতের শুচিতার প্রশ্ন কর্পূরের মত উবে যায় যখন উঁচুজাতির গ্রামবাসীরা নিচুজাতির 'অস্পৃশ্য' সুরেখা বা প্রিয়াঙ্কাদের অবলীলায় গণধর্ষণ করে খুন করতে পারে, সাগর বা ইন্দ্রদের পিটিয়ে হত্যা করতে পারে। এই জঘন্য জাতি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বাবাসাহেব আম্বেদকার-এর করা মন্তব্যটা তাই আজকের দিনেও সমান, হয়তো বা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ – "There cannot be a more

degrading system of social organization than the caste system. It is the system that deadens paralyses and cripples the people from helpful activities.”

ভারতবর্ষের মূলধারার ইতিহাস-চর্চায় ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকর-কে কোনোদিনই সেইভাবে যথাযথ স্থান দেওয়া হয়নি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আম্বেদকরকে একটি গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এক অদৃশ্য অশুভ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই আম্বেদকর শুধু দলিতদের নেতা হয়ে রয়ে যান। আর প্রিভিলেজ্‌ড মানুষজনের কাছে তিনি ভারতের সংবিধানের রচয়িতা। জাতি-ব্যবস্থা, ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যে সংগ্রাম, তাঁর যে সংস্কার-মুক্ত আধুনিক চিন্তাভাবনা ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী ক্ষমতাসীনদের রচনা করা ইতিহাসের নিচে পিষ্ট হয়ে এসেছে, ‘আম্বেদকর’ আর ‘সংবিধান’ শব্দদুটো একে অপরের সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এও যেন এক দুরভিসন্ধির পরিণাম। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে কৌশলে তাঁকে সংবিধানের জনক বানিয়ে দেওয়া হলো, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সংবিধানের ফাঁকফোকড়-কে ঘিরে ওনার একটা ঋণাত্মক মূল্যায়ন করতে পারে। এই পরিকল্পনার স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কারণ আম্বেদকরকে ঠিক যতটা কোণঠাসা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, ঠিক ততটাই কোণঠাসা তিনি হয়েছেন, জীবদ্দশাতেও, এবং মৃত্যুর পরেও। আম্বেদকর নিজে যে এই সংবিধানে

একেবারেই খুশী ছিলেন না সেটা ২-রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩-তে, রাজ্যসভায় প্রদত্ত একটা ভাষণে স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনি বলেন – "Now, Sir, we have inherited a tradition. People always keep saying to me: 'Oh, you are the maker of the Constitution.' My answer is I was a hack. What I was asked to do, I did much against my will."। তাই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও যেখানে এই দেশ জাতপাতের ব্যাধিতে আক্রান্ত, সেখানে প্রয়োজন আছে সংবিধানের সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে এসে আম্বেদকরের এক পরিপূর্ণ মূল্যায়নের। কারণ, আম্বেদকর এমন একজন শিক্ষক, যিনি আমাদের প্রশ্ন করতে শেখান, যাবতীয় প্রাচীন (কু)সংস্কারের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ টিকে থাকা নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চবর্ণের মানুষের একচেটিয়া শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

এই সামাজিক বৈষম্য ও তাকে ঘিরে এই অত্যাচারের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অবশ্যই গিয়ে পড়তে হবে হিন্দুশাস্ত্রের ফাঁকফোকরে। এই বৈষম্য কোনো একদিনে তৈরি হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে এই বৈষম্যকে লালন-পালন করা হয়েছে, আরও হৃষ্টপুষ্ট বানানো হয়েছে। তাই মাত্র কয়েক দশক পুরানো সংরক্ষণ নীতি, যে নীতির প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ নিয়ে আজও বিস্তর বিতর্ক হয়ে চলে, সেই নীতিও স্বাভাবিকভাবেই অপারগ এই বিরাট

ফাঁক কে দূর করতে। হিন্দুশাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল 'মনুস্মৃতি' অনুযায়ী তাই কোনো শূদ্র যদি ভুল করেও 'পবিত্র' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে কিংবা শুনে ফেলে তাহলে তার জিভ ছিঁড়ে নেওয়া হবে, অথবা তার কান গলিত গরম সীসা ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং, পবিত্র বেদমন্ত্রকে যদি জ্ঞানলাভের প্রাচীনতম আধার হিসাবেই দেখি তাহলে এটা খুবই স্পষ্ট যে শুরু থেকেই সেই আধার সকলের জন্য নয়। শুরু থেকেই সেই আধার একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য তৈরি, যাতে শিক্ষা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে আরেক শ্রেণীর উপর যুগের পর যুগ ধরে শোষণ চালানো যায় বিনা বাধায়। তাই চতুর্বর্ণের শুরুতেই যখন উদ্দেশ্য অসৎ, শুরুতেই যখন উদ্দেশ্য মৌলিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে একটা বাধ্যতামূলক নির্ভরতার সম্পর্ক তৈরি করা এবং সেটাকে সময়ের সাথে বিভিন্ন রূপে লালন করা, ক্ষমতাশীল উচ্চবর্ণের কাছে ক্ষমতাহীন নিম্নবর্ণের বাধ্যতামূলক বশ্যতা স্বীকার করার এক ব্যবস্থা তৈরি করা – তখন এই অত্যাধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে অবশ্যই প্রয়োজন আছে সেই আম্বেদকারকে জানার, যিনি নব্বই বছরেরও বেশি সময় আগে 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রক্ষণশীল সমাজের কাছে, ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের কাছে আম্বেদকার আজও এক বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর "অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট" আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। এই লেখাটি বক্তৃতার

আকারে তিনি তৈরি করেছিলেন ১৯৩৬ সালে। "জাত-পাত তোড়ক মণ্ডল" নামক এক গোষ্ঠীর হয়ে তাঁর সেই বক্তব্য রাখার কথা ছিল, সমাজে বর্ণবৈষম্যের কু-প্রভাব গুলো তুলে ধরার জন্য। কিন্তু সেই বক্তব্যের ধার এতটাই ছিল যে সেটার খসড়া পড়ার পর র‍্যাডিক্যাল হিন্দুদের নিয়ে তৈরি সংস্কারপন্থী সেই গোষ্ঠীও শেষ পর্যন্ত এই বক্তব্য বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও সেই বক্তব্য একেবারে অব্যক্ত থাকেনি। আম্বেদকর নিজ উদ্যোগে সেটা ছাপিয়েছিলেন "অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট" নামে, এবং বিতরণ করেছিলেন। শাস্ত্রের লেখা কারও কাছে অন্য বার্তা বহন করলে সেটা শাস্ত্রের লেখার দোষ নয়, কারণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রের লেখা চিরন্তন সত্য, অবিনশ্বর – এই বস্তাপচা যুক্তি দিয়ে বারেবারেই হিন্দুশাস্ত্র ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে। তার উত্তরে আম্বেদকর "অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট"-এ লিখেছেন – "It is no use telling people that the shastras do not say what they are believed to say, if they are grammatically read or logically interpreted. What matters is how the shastras have been understood by people." আরেকধরণের ভাঁওতাবাজী, যেটা প্রায়শই একটু কম রক্ষণশীলরা বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তি রক্ষার জন্য বলে থাকেন, সেটা হল – বেদ অনুযায়ী এই প্রথা কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করে, তাই মানুষের জন্ম তার বর্ণ নির্ধারণ করতে পারেনা। আপাতদৃষ্টিতে খুব প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গি মনে হলেও, এর

বাস্তব গ্রহণযোগ্যতাকে অকাট্য যুক্তিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন আম্বেদকর। তিনি জানতে চেয়েছিলেন – "How are you going to compel people who have acquired a higher status based on birth, without reference to their worth, to vacate that status? How are you going to compel people to recognize the status due to a man, in accordance to his worth, who is occupying a lower status based on his birth?"

এই প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি। তার একটা বড় কারণ – সদিচ্ছার অভাব। তাই সংরক্ষণ নীতি থাকা সত্ত্বেও, বহুক্ষেত্রে এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ ও সেই প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার পরিমাণ শূন্য। সংরক্ষণ নীতির জন্য যোগ্য হতে গেলে একজন দলিতকে হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোতে হবে। সেই হিসাবে এই সংরক্ষণ নীতির সুবিধা প্রতি চারজন দলিতের মধ্যে মাত্র একজনই পেতে পারে। বাকি তিনজনকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে হাইস্কুল পেরোনার আগেই পেটের চিন্তা করতে হয়। তাই সংরক্ষণ নীতি আদপে ততটা কার্যকর হয়ে ওঠে না, যতটা তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দাবি করেছিল। তবে যেটা চলে, সেটা হলো এই নীতি কে নিয়ে দর-কষাকষির রাজনীতি। পরিণাম – "যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে টানিবে যে নীচে / পশ্চাতে রেখেছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"। একদা আম্বেদকরও বলেছিলেন – "If

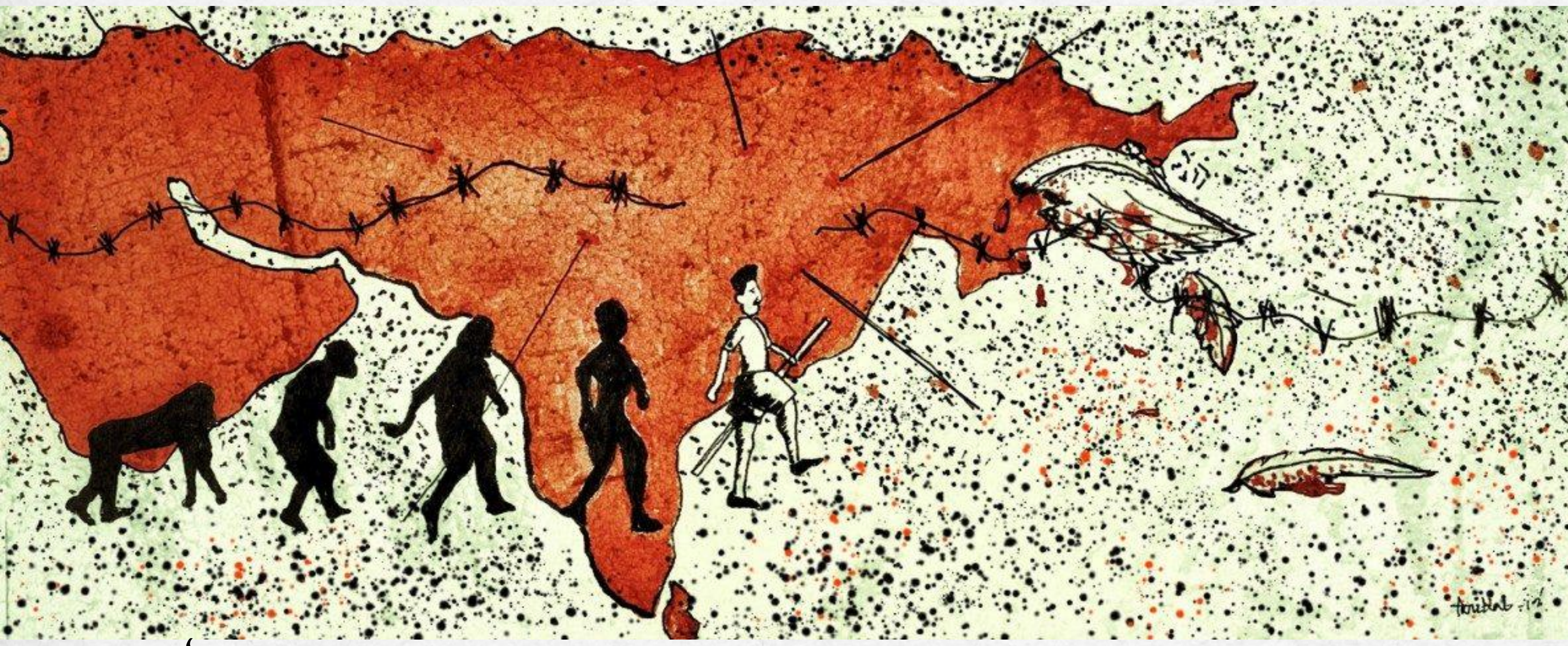
the fundamental rights are opposed by the community, no Law, no Parliament, no Judiciary can guarantee them in the real sense of the word."। এই কথাটা আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ, যতটা সেদিন ছিল।

"আমি শেষ চেষ্টা করে দেখলাম যে, হিন্দুধর্মের পুনর্জীবনের আর কোন সম্ভাবনা নাই। তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে আমাকে হিন্দুধর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে।"

- ড. বি. আর. আম্বেদকর

যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসচর্চা

লিখেছেন - মনীশ রায়চৌধুরী



ইতিহাস! সেকি রবিবারের সকালে আবার ইতিহাস কেন? সে-তো স্কুলে অনেক পড়েছি। কত কষ্ট করে বাবর, হুমায়ুন, আকবর সব ফর্মুলা করে মনে রাখতাম। পানিপথের যুদ্ধ থেকে সিপাহী বিদ্রোহের সাল তারিখ সব মনে রেখে বড় বড় অক্ষরে খাতায় লিখতাম। বড় বড় অক্ষরে লিখলে বেশি পাতা লাগবে। যে যত এক্সট্রা পাতা নিত সে তত নম্বর পেত।

ইতিহাস বললেই আমাদের অধিকাংশ লোকের মনে এই ছবিটাই ভেসে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসচর্চা তো শুধুমাত্র রাজা-বাদশার যুদ্ধের সাল-তারিখ মনে রেখে নম্বর পাওয়া

নয়, তার বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। ইতিহাস চর্চা সামগ্রিকভাবে করতে হলে বুঝতে হলে ভুগোল, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি সবকিছুই আলোচনা করতে হয়।

ইতিহাসচর্চার সঠিক পদ্ধতি জানা বর্তমানে আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কারণ বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আরএসএস মতাদর্শপুষ্ট বিজেপি সরকার এই চর্চাকে গুলিয়ে দিতে চাইছে। ভারতীয় সংস্কৃতির স্বঘোষিত সেই ইজারাদারের দল স্বকপোলকল্পিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ এজেন্ডাকে ভারতের "চেপে রাখা প্রকৃত ইতিহাস" বলে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। তারা রাম, কৃষ্ণ, হনুমান প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রদের ঐতিহাসিক বলে দাবি করছে। যেহেতু প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা থেকে মিডিয়া সবকিছুই তাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে তাই সেই অবাস্তব দাবি মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। বাবরি মসজিদ, রাম জন্মভূমি ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের রায় তারই প্রমাণ। এই রায়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে এবার তারা মথুরাতে মসজিদের জমিতে কৃষ্ণের জন্মভূমি 'আবিষ্কার' করেছে। মোদ্দা কথা, এরা এমন এক ভারতের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যার প্রাচীনকালের আর্য ঋষিরা জ্ঞানবিজ্ঞানে আধুনিক প্রযুক্তির যুগের থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং পরবর্তীকালে আগত মুসলিম শাসকদের হাতে পড়েই তাদের কল্পিত ভারতমাতার গরিমা নষ্ট হয়েছে। ভারতের যা কিছু সর্বনাশ

হয়েছে সব কিছুর জন্য মুসলিম শাসকেরা দায়ী। তারাই নাকি হিন্দুদের গর্বের ঐতিহ্য নষ্ট করে দিয়েছে, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়েছে। এবং এই 'ভারতীয় সংস্কৃতির' পুনরুদ্ধার করে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তোলাই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা এক অন্য ভারতের সন্ধান পাব। আমরা দেখতে পাব ভারতের প্রাচীনযুগে আধ্যাত্মবাদী দর্শনের পাশাপাশি বস্তুবাদী দর্শনেরও প্রবল চর্চা ছিল। শুধুমাত্র চার্বাক নয়। ভূতবাদ, স্যাদবাদ, সাংখ্য, মীমাংসা, বৌদ্ধ, জৈন দর্শন ছিল। ভারতের প্রাচীনতম দর্শন মীমাংসা তো ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপরেও গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন তুলেছিল। প্রকৃত বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর বা অলৌকিকতার কোন স্থান নেই। গৌতম বুদ্ধ বিনা প্রমাণে এমনকি তার কথাও মেনে নিতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের ফলে বৌদ্ধ ধম্ম (ধর্ম নয়) নিজের শুদ্ধতা অক্ষত রাখতে পারেনি। সম্ভবত ৭৮ খৃ:পূ:'তে কুন্দলবনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতিতে তারা হীনযান এবং মহাযানে বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযানী বৌদ্ধরা তাদের মূলরূপ ধরে রাখে। কিন্তু বর্তমান ভারতে তাদের আর প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। মহাযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে প্রচার করে থাকে। সেখানে বৌদ্ধতন্ত্র থেকে জন্মান্তরবাদ নামক কুসংস্কার সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং রাজতন্ত্রের মিলিত আগ্রাসনের কারণ শুধু ধর্মীয় ছিল তা নয়। প্রাচীন ভারতে বেশ কিছু গণপ্রজাতন্ত্রী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। যেখানে দলের লোকেরা ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করত এবং আধুনিক কালের মত নির্দিষ্ট সময় অন্তর সদস্যরা তা পরিবর্তন করতে পারত। বুদ্ধের জন্মের সময় তার বাবা শুদ্ধোদনও এমনই এক দলপতি ছিলেন। যেটাকে পরে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দু রাজা বলে প্রচার করে।



স্বাভাবিক ভাবেই এমন গণরাজ্য রাজতন্ত্রের পক্ষে বিপদ। বুদ্ধের প্রভাবে এরকম গণরাজ্য বেড়েছিল। ফলে বৌদ্ধ চিন্তাচেতনাকে সমূলে উৎপাটন করা পুরোহিততন্ত্র এবং রাজতন্ত্র উভয়ের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। প্রকৃত সত্য এটাই প্রাচীন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ছিল বলে নব্য হিন্দুত্ববাদীরা যে গর্ব করে অর্থাৎ আর্যভট্ট, চরক, সুশ্রুত

এদেরকে প্রাচীন ঋষিমুনি বলে দেখাতে চায় তা ভ্রান্ত। আসলে এই জ্ঞানতাপসেরা ছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল বৌদ্ধ প্রভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষাকেন্দ্র।

আমরা কথায় কথায় বলে থাকি মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের মন্দির ভেঙে দিয়ে মসজিদ গড়েছে, গণহত্যা করেছে, জবরদস্তি ধর্ম পরিবর্তন করেছে। কথাটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা নয়। কিন্তু, যে কথা তারা চেপে যায় তা হল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা রাজতন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাকদের সাথে একই কাজ করেছে। মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে তো এদের অসুর, রাক্ষস বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' তে উল্লেখ আছে রাজা হর্ষদেব প্রায় ৪,০০০ বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন।
পারমার বংশের সুভাতবর্মন থেকে চোল বংশের রাজারা, বাংলায় রাজা শশাঙ্ক সবাই বৌদ্ধ, জৈনদের ব্যাপক গণহত্যা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা'র সপ্তম খন্ডে পাওয়া যায় পুরীর সুবিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরও আসলে বৌদ্ধ স্থাপত্য।

বর্তমানে সুচতুর ভাবে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হয়েছে। পুরো ইতিহাসকেই আমাদের হিন্দু-মুসলিম ন্যারেটিভের মাধ্যমে দেখিয়ে সমাজে বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো

হচ্ছে। ফর্মুলা খুব সহজ, হিন্দু রাজারা ছিল দেশপ্রেমিক আর সুলতানী এবং মুঘল আমলের শাসকরা বিদেশী আক্রমণকারী। তাই রাণা প্রতাপ-আকবর, শিবাজি-ঔরঙ্গজেব প্রভৃতির পারস্পরিক ক্ষমতা দখলের লড়াইকেও প্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয়।

কিন্তু, ইতিহাস শুধুমাত্র তথ্যপ্রমাণকেই মান্যতা দেয়। মুসলিম শাসকেরা আসার পূর্বে তো ভারতে সবাই হিন্দু রাজা ছিল। তারা কিন্তু ধর্মের জন্য কেউ কাউকে ছেড়ে দিত না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। সুলতানী আমলেও গোঁড়া মুসলিম শাসকের পাশাপাশি পরধর্মসহিষ্ণু বাদশাহদেরও উল্লেখ পাই। এমনকি পাগলা রাজা বলে ব্যঙ্গ করা মহম্মদ-বিন-তুঘলক তো কালীমূর্তি খোদাই করা মুদ্রাও চালু করেছিলেন। আবার ১২৯৬ সালে আলাউদ্দিন খিলজি তার কাকা জালালউদ্দিন খিলজির মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে নিয়ে দিল্লির গদিতে বসেছিলেন। এখানেও কিন্তু ধর্ম নয় ক্ষমতার লোভই মূল কথা। তাই আমরা দেখতে পাই আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজপুত রাণা মানসিং আবার রাণা প্রতাপের সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। আকবরের অন্যতম অর্থমন্ত্রী হিন্দুরাজা টোডরমল। নবরত্ন সভায় 'বীরবল' নামে ভূষিত ব্যক্তিও ছিলেন হিন্দু নাম মহেশ দাস।

হিন্দুত্ববাদীরা সম্ভবত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উপর সবচেয়ে বেশি খড়্গহস্ত। তিনি যে ধর্মীয় ভাবে অন্যান্য মুঘল শাসকদের তুলনায় গোঁড়া ছিলেন এমনকি কাশীতে মন্দির ভেঙেছিলেন তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তা অর্ধসত্য মাত্র। সত্য এটাই আকবরের আমলে মুঘল সেনাবাহিনীতে হিন্দুসেনা ছিল প্রায় ২৪% যা ঔরঙ্গজেবের আমলে বেড়ে হয় ৩৩%। তার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন রাজপুত জয়সিং। আমরা শুধু তিনি মন্দির ভেঙেছিলেন বলে দোষারোপ করি। কিন্তু তিনি মহাকাল মন্দির, মথুরার কৃষ্ণ মন্দিরে দান করেন। ১৬৮০ সালে বেনারসেই ভগবৎ গোঁসাইকে আশ্রম গড়তে, ১৬৮৫ তে কুমারস্বামী মঠ প্রতিষ্ঠা, ১৬৮৭ সালে রামজীবন গোঁসাইকেও আশ্রম করার জমি দেন। বস্তুত, হিন্দুবিদ্বেষী বলে প্রচার করা ঔরঙ্গজেব এত বেশি পরিমাণে হিন্দু মঠ, মন্দির, আশ্রম গড়তে সাহায্য করেছিলেন যে শুধু সেটাই আলাদা অধ্যায় হয়ে যেতে পারে। আরও মজার কথা তিনি কিন্তু মসজিদও ভেঙেছিলেন। কুতুবশাহীর শেষ নবাব গোলকুণ্ডার তানাশাহ তাকে খাজনা না দিয়ে জামিয়া মসজিদের তলায় সম্পত্তি লুকিয়ে রেখেছিল। ঔরঙ্গজেব চর মারফত খবর পেয়ে ১৬৮৩ সালে মসজিদ ভেঙে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করেন এবং তানাশাহ'কে বন্দী করেন। অর্থাৎ, রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে ধর্ম কখনোই তার কাছে মুখ্য ব্যাপার হত না।

কিন্তু, এসব সত্য বললে তো নব্য হিন্দুদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হবেনা। তাই তারা শিবাজি-ঔরঙ্গজেব দ্বৈরথের ঘটনাকে হিন্দু মুসলিম ন্যারেটিভে প্রচার করে।

সেই মহাজ্ঞানীরা জানেওনা শিবাজির ১৩ জন মুসলিম সেনাপতি ছিলেন তাদের নাম সিদ্দি হিলাল, দৌলত খান, ইব্রাহিম খান, কাজি হায়দার, সিদ্দি ইব্রাহিম, সিদ্দি ওয়াহওয়াহ, নুর খান বেইগ, শমা খান, হুসেইন খান মিয়ানি, সিদ্দি মিস্ত্রি, সুলতান খান, দাউদ খান আর মাদারি মেহেতার।

ঔরঙ্গজেব যখন শিবাজিকে কৌশলে দুর্গে বন্দি করেন তখন মাদারি মেহেতার তার 'বডি ডামি' সেজে কেল্লায় বন্দী থেকে তাকে পালাতে সাহায্য করেন।

ক্রুদ্ধ ঔরঙ্গজেব শাস্তি হিসেবে মাদারির শিরচ্ছেদ করেন।

পুনশ্চঃ, আফজল খানের সাথে শিবাজির যুদ্ধ এবং বাঘনখ দ্বারা তাকে হত্যা করার ঘটনা আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু, আমাদের এটা জানানো হয়না আফজলের সহকারী হিসাবে সেই তাঁবুতে শিবাজিকে হত্যা করার জন্য উপস্থিত অপর ব্যক্তির নাম ছিল কৃষ্ণ ভাস্কর কুলকার্নি।

১৭৪১-১৭৫১ সালের ভিতর পাঁচবার রাঘোজি ভোঁসলে, ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠারা সুবা বাংলা আক্রমণ করে। তারা প্রায় চার লাখ মানুষকে হত্যা করে। ব্যাপক লুণ্ঠন, ধর্ষণ চালায়। তাদের অত্যাচারের তীব্রতা এতটাই বাঙালির মনে দাগ কেটেছিল যে "বর্গী এলে দেশে"

শিশুদের লোককথায় স্থান পায়। পরাজিত নবাব আলিবর্দি খাঁ ১৭৫১ সালে মারাঠাদের সাথে বার্ষিক ১.২ মিলিয়ন অর্থ চৌথ এবং ৩.২ মিলিয়ন অর্থ বিগত দশ বছরের যুদ্ধখরচ দিয়ে মারাঠাদের সাথে চুক্তি করেন যে তারা আর বাংলা আক্রমণ করবেনা। বাঙালি কবি গঙ্গারাম মারাঠাদের অসুরের সাথে তুলনা করে 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচনা করেন এবং দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেন তিনি যে বাংলাকে বর্গী হানা থেকে রক্ষা করার জন্য নবাব আলিবর্দিকে আশীর্বাদ করেন।

১৭৯১ সালে মারাঠাদের হিন্দু নির্যাতনের আরও একটা উদাহরণ পাওয়া যায়। তারা শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু সুলতানকে পরাজিত না করতে পারার হতাশায় শৃঙ্গেরি শঙ্করাচার্যের মঠ ভেঙে দেয় এবং হত্যাকাণ্ড চালায়। মঠাধ্যক্ষ টিপুকে এই ঘটনা জানালে তিনি তৎক্ষনাৎ 'আসাফ অফ বেদনুর'কে ত্রাণকার্যে ২০০ 'রাহতি' পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ইতিহাস ঘাঁটলেই এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে যেখানে হিন্দু রাজা হিন্দু রাজার সাথে, মুসলিম শাসকেরা মুসলিমদের সাথেই লড়াই করে মরেছে। তাদের ধর্মীয় পরিচয় কিন্তু মুখ্য হয়ে ওঠেনি। তাদের ক্ষমতা দখলের শাসন করার, শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে

তোলার ইচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই ইতিহাস পড়ার সময় ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের চশমা খুলে ফেলা উচিত।

এত দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করার একটাই কারণ। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিজেদের কর্পোরেট লবির স্বার্থরক্ষায় দরিদ্র বঞ্চিত ভারতবাসীকে এক হতে দিতে চায়না। তারা চায় জাতি, ভাষা, ধর্মের নামে নিপীড়িতরা নিজেদের ভিতরেই লড়াই করুক। তাই হাজার দু'হাজার বছর আগে কোন ধর্মের শাসক কার উপর অত্যাচার করেছে সেই ইতিহাস তুলে এনে আজ বিকৃত মানসিকতায় ধর্মীয় বিদ্বেষের চর্চা করবেন না, করলে নিজেরাই ইতিহাস হয়ে যাবেন।

“রাজনীতিবিদরা তাদের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য যে অস্ত্রটি ব্যবহার করেন তা হচ্ছে ইতিহাস।” History is a tool used by politicians to justify their intentions.

- টেড কোপেল (Ted Koppel)

সিভিলাইজেশন স্কেল

লিখেছেন - সে খ রা মি জু ল ক রি ম



আমরা জানি পৃথিবী এবং সভ্যতা বিগত ২০০,০০০ বছর ধরে এটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সময়ের সঙ্গে প্রচুর পরিবর্তন অনুভব করেছে। মানব প্রজাতি মহাবিশ্বের বিপুল ১৩.৭ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন=১০০ কোটি) বছর বয়সের মাত্র ০. ০০১৫ % সময় ধরে অস্তিত্বে আছে। মানবতা সেই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি দূর্জয় কাজকে জয় করেছে। আমরা আগুনের ব্যবহার ও শিকার করা থেকে, পুরো গ্রহে উপনিবেশ গঠন এর মত কাজ করেছি যা তুলনামূলক

ভাবে মহাজাগতিক স্তরের দিক থেকে দেখলে চোখের পলক পড়ার থেকেও কম সময়য়ে। এর মধ্যে কিছু মহান চিন্তাশীল মস্তিষ্ক আধুনিক সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং এমন কিছু লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেছেন যা একসময় অসম্ভব আমাদের কাছে পুরোপুরি অসম্ভব ছিল, অন্তত সেটাই মনে করা হতো।

কিন্তু, বিগত ১৫০ বছরে আমরা পৃথিবীর মাটিতে সীমাবদ্ধ থাকা থেকে আমাদের নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী চাঁদে পদার্পণের যোগ্যতা অর্জন করেছি। মানবতার সাফল্য যথেষ্ট প্রশংসনীয়, তবে সেটা শুধুমাত্র আমাদের নিরিখে। বাস্তবে মহাজাগতিক পর্যায়ে আমাদের প্রযুক্তির থেকে উন্নত কোনো এলিয়েন প্রজাতির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলে কী ঘটবে তা আমাদের কল্পনার অতীত।

১৯৬৪ সালে সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ 'নিকোলাই কারদাশেভ', অনুমানমূলক একটি লগারিদমিক স্কেলের ধারণা দেন যা কোনো সভ্যতা মোট যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি সম্ভাব্য সভ্যতার স্তর পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই স্কেলটি থেকে ভবিষ্যৎ সভ্যতা কিরকম হবে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী 'করদাসেভ' তাঁর স্কেলটি তে তিনটি প্রকারের সভ্যতার কথা বলেন -

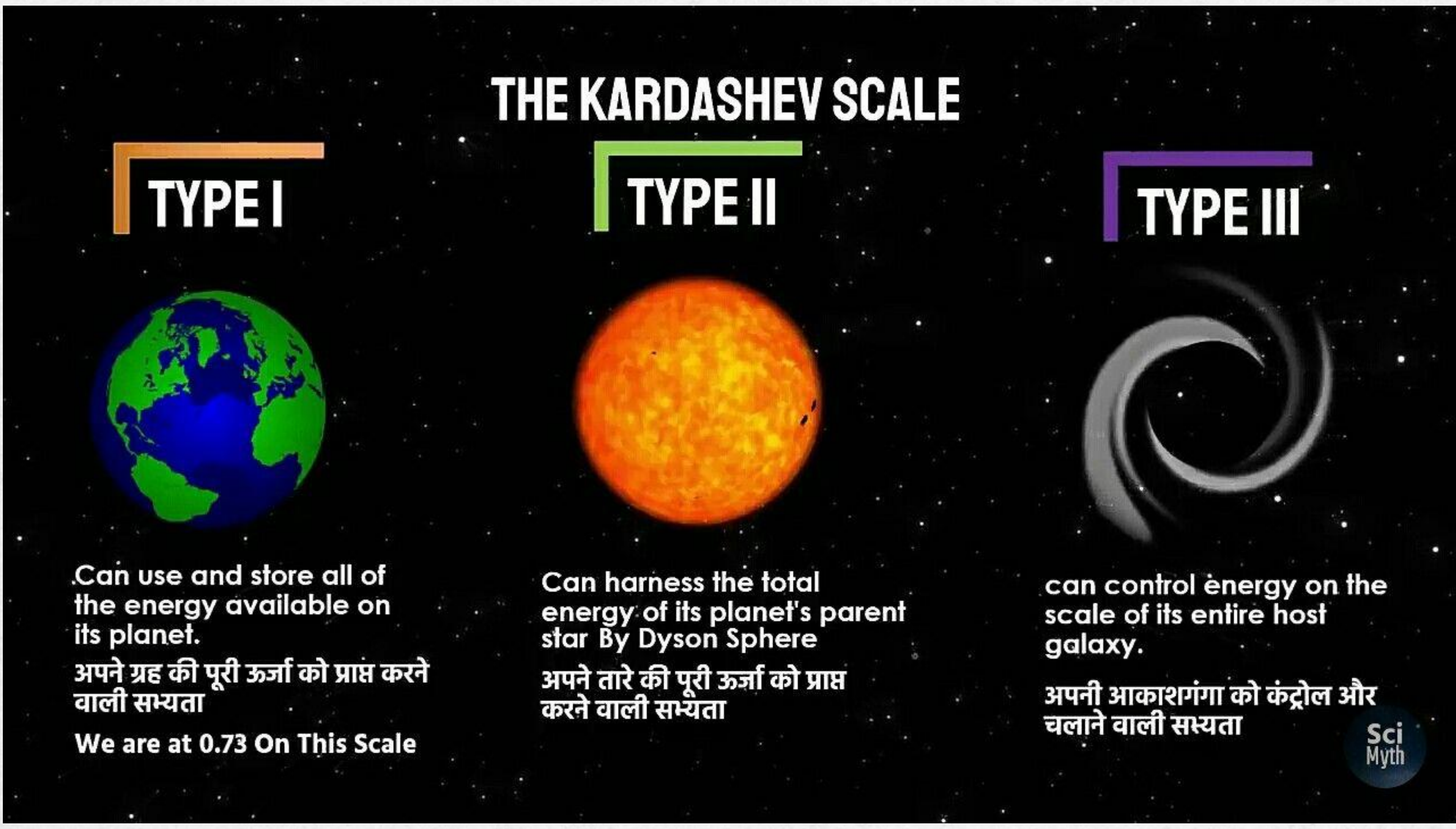
টাইপ ১

টাইপ ২

টাইপ ৩

তবে পরবর্তীকালে কিছু সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়েছে।

'কারদাসেভ' শক্তির উপর ভিত্তি করে সভ্যতার তিনটি স্তরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।



টাইপ ১: এই প্রকার সভ্যতাকে একটি গ্রহ সভ্যতাও বলা হয়। বলা বাহুল্য এটি আমাদের বর্তমান সভ্যতার মতো নয়।

এই সভ্যতা, তাদের গ্রহটিকে তার হোস্ট স্টার (আমাদের ক্ষেত্রে সূর্য) থেকে পৌঁছানো সমস্ত শক্তি সঞ্চয় এবং ব্যবহার করতে সক্ষম। এই বিপুল শক্তির পরিমাণ প্রায় 1.74×10^{17} ওয়াট হবে। পৃথিবীতে আধুনিক সভ্যতাকে

টাইপ ১ সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করলে মানুষ উন্নত সভ্যতার সর্বনিম্ন স্তরেও স্থান পাবে না। আধুনিক মানব সভ্যতাকে স্কেল অনুযাই পরিমাপ করার জন্য বিজ্ঞানীরা 'কারদাসেভ স্কেলে' এক ধরণের বর্ধিত শূন্যের লাইনের সৃষ্টি করেছেন। যখন এই স্কেলটি প্রস্তাবিত হয়েছিল বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, 'ন্যাশভিলের' পদার্থবিদ 'কার্ল সাগান', কারদাসেভ স্কেল অনুযাই একটি সভ্যতার অবস্থান এবং সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য একটি গাণিতিক সূত্র তৈরি করেন। সূত্রটি হলো,

"$K=(\log_{10} p-6/10)$"

যেখানে 'K' একটি সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং 'P', ওই সভ্যতা যতটা পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে তার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২০১৮ সালে বিশ্বের মোট শক্তি খরচের পরিমাণ ছিলো ১৮.৪০ টেরাওয়াট, এখন এই সংখ্যাটিকে 'P' তে যুক্ত করলে কারদাশেভ স্কেলে আমাদের সভ্যতার রেটিং হবে প্রায় ০.৭৩|

যদিও আমাদের গ্রহটির কয়েক বিলিয়ন মানুষ নিয়ে একটি সভ্যতা রয়েছে,আমরা পৃথিবীর কক্ষপথে সফল ভাবে স্যাটেলাইট স্থাপন করেছি, মহাকাশযানে চড়ে চাঁদে অভিযান করেছি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন তৈরি করেছি, কয়েকশো মিলিয়ন(১ মিলিয়ন=১০লক্ষ্য) কিলোমিটার ব্যায় করে অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলকে

উপনিবেশ করার দাবি করেও আমরা এখনও কারদাশেভ স্কেলে '১' ও স্কোর করতে পারিনি।

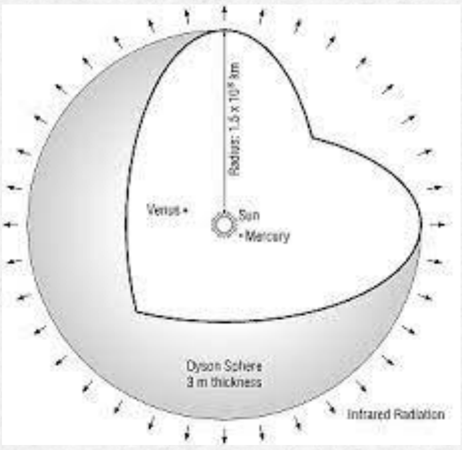
'কার্ল সাগান' অনুসারে মানবতা, সভ্যতার সবে প্রযুক্তিগত কৈশোরের ধাপ পেরিয়েছে।

জাপানের বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী 'মিচিও কাকু'র দাবি অনুযায়ী মানুষ যদি প্রতি বছর গড়ে ৩% হারে শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে যায় তাহলে পরবর্তী ১০০ থেকে ২০০ বছরে 'টাইপ ১' স্ট্যাটাস, কয়েক হাজার বছর পরে 'টাইপ ২' স্ট্যাটাস এবং ১০০,০০০ থেকে ১ মিলিয়ন বছরে 'টাইপ ৩' স্ট্যাটাস পেতে পারে।

আমরা পরের দু'শো বছরে 'টাইপ ১' সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এটি মানবতার পক্ষে এক বিশাল পদক্ষেপ। 'কার্দাসেভ' অনুযাই এই ধরণের সভ্যতায়(টাইপ-১) আমাদের নিজস্ব গ্রহের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে, সম্ভবত আমরা আবহাওয়ার পরিবর্তনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। অর্থাৎ weather control করতে সক্ষম হব। আমাদের নিজস্ব গ্রহের ভূতাত্ত্বিক মেকআপ নিয়ন্ত্রণ এবং আরও অনেক কিছু করতে সক্ষম হব। যদিও পরবর্তী টাইপ সভ্যতার তুলনায় এই পরিমাণ ক্ষমতার পরিমাণও সামান্য।

টাইপ ২: এই প্রকার সভ্যতাগুলিকে একটি উজ্জ্বল সভ্যতা হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়, এই সভ্যতা তাদের হোস্ট স্টার এর মোট শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে সক্ষম। নক্ষত্রের

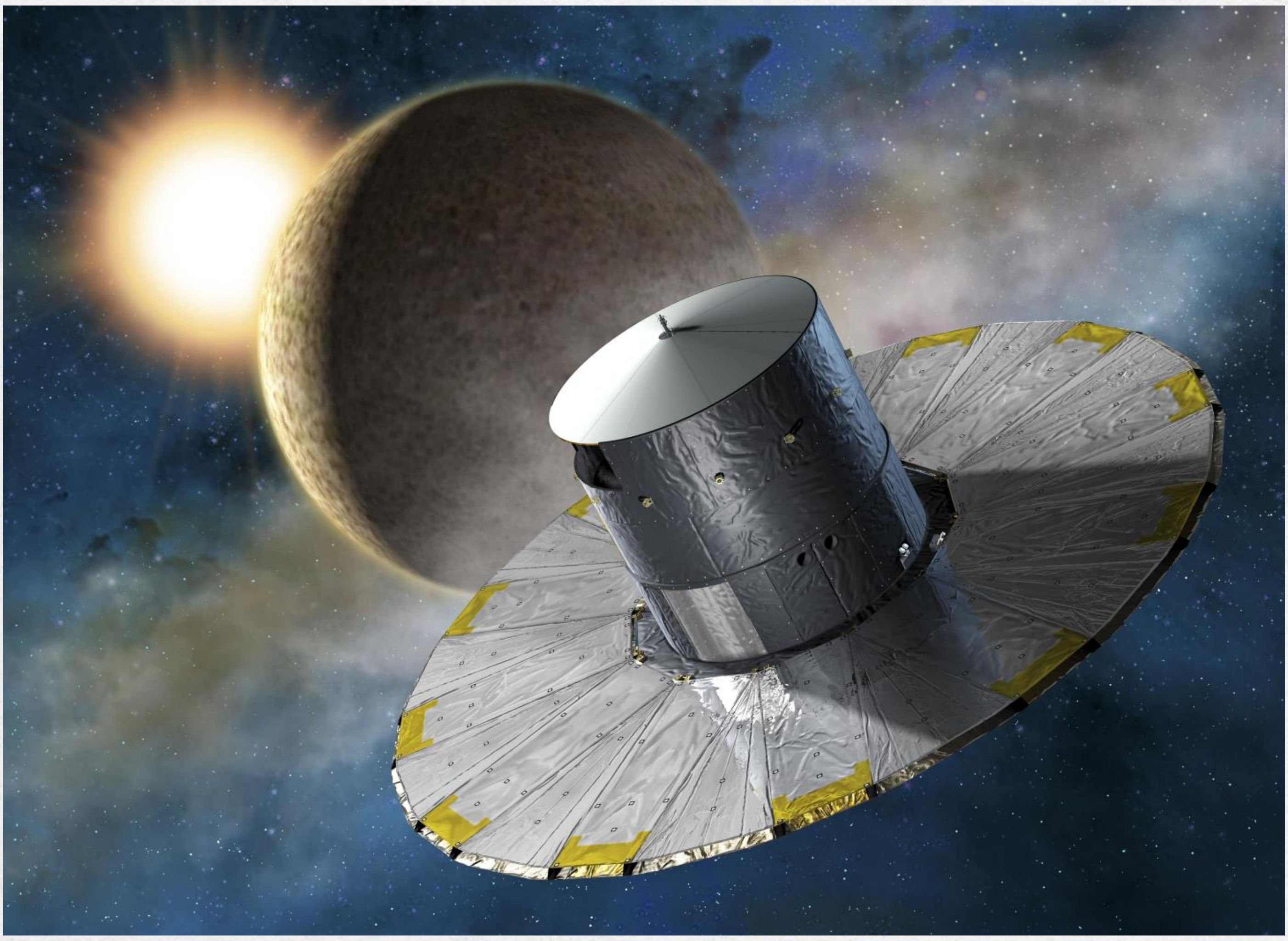
পুরো শক্তির আউটপুটকে একত্রিত করে ব্যবহার করার জন্য একটি জনপ্রিয় তাত্ত্বিক (theoretical) যন্ত্র (device/machine) হলো 'ডাইসন স্ট্রাকচার' বা 'ডাইসন স্ফিয়ার'। অনেক জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও সিনেমাতে এই ডিভাইস আগেও দেখে থাকতে পারেন।



১৯৬০ সালে আমিরিকান পদার্থবিদ 'ফ্রিম্যান ডাইসন' এই স্ট্রাকচারের ধারণা দেন। মূলত এটি নক্ষত্রের চারপাশে নির্মিত বিশাল আকারের একটি উন্মুক্ত ফাঁপা গোলক যা নক্ষত্র থেকে নির্গত বিপুল শক্তি কে সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করবে। টাইপ ২ সভ্যতার শক্তির আরেকটি উৎস হলো নিকটবর্তী 'ব্ল্যাক হোল'- এর 'অ্যাক্রেশন ডিস্ক' থেকে নির্গত ফোটন সংগ্রহ করা। এখন, কোনও সভ্যতা কীভাবে, কোন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ব্ল্যাকহোলের অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে শক্তি সংগ্রহ করবে আমাদের চিন্তাভাবনার বাইরে। যাইহোক, একটি টাইপ ২ সভ্যতা কেবল এই রকম অবিশ্বাস্য আকৃতির স্ট্রাকচার তৈরি করবে তা নয়, তারা তাদের সৌরজগতের যেকোনো গ্রহে ইচ্ছেমত উপনিবেশ গঠন করবে এবং গ্রহোগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, গ্রহাণুগুলিকে খনন করবে,বিভিন্ন গ্রহে ভ্রমণ বানিজ্যিক স্তরে নিয়ে যাবে, এক কথাই তাদের সৌরজগতের অভ্যন্তরে তারা যা ইচ্ছে তাই করবে।

বলা বাহুল্য যেমন আমাদের বর্তমান সভ্যতার সাথে কোনও টাইপ ২ সভ্যতার তুলনা চলে না তেমনি টাইপ ১ সভ্যতার সাথে কোনো টাইপ ৩ সভ্যতার তুলনা করার মত কিছুই নেই।

টাইপ ৩: একটি টাইপ 3 সভ্যতা যা গ্যালাকটিক সভ্যতা হিসাবেও পরিচিত, এই সভ্যতা তাদের সম্পূর্ণ হোস্ট গ্যালাক্সির (ছায়াপথের) মোট শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই সভ্যতা যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করবে তা সত্যই ভীতিজনক (অন্তত আমাদের কাছে), যা শুনতে অনেকটা সায়েন্স ফিকশন সিনেমার মত।



তারা টাইপ ২ সভ্যতার মতোই চূড়ান্তভাবে কাজ করবে, গ্রহ এবং গ্রহাণু মাইনিং (খনন) করবে, ডাইসন স্ফিয়ার বা তারথেকেও অ্যাডভান্স টেকনোলজি ব্যবহার করে নক্ষত্রের শক্তি সংগ্রহ করবে। এবং শক্তি

সংগ্রহের জন্য তারা কেবলমাত্র একটি নক্ষত্র নয়, কোটি কোটি নক্ষত্র ব্যবহার করবে।

এই রকম শক্তিসমপন্ন একটি সভ্যতা পুরো গ্যালাক্সিতে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে। ছায়াপথ আপাতদৃষ্টিতে তাদের খেলার মাঠে পরিণত হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে যখন শক্তির চাহিদা আরও বাড়বে তখন তারা প্রথমে নিকটবর্তী ব্ল্যাকহোলের শক্তি তারপর যখন চাহিদা আরো বাড়বে তখন তাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র অবস্থিত 'সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল' থেকে তারা শক্তি সংগ্রহ করবে। (যেমন, আমাদের আকাশগঙ্গা বা milkey Way গ্যালাক্সির কেন্দ্রে 'সাজেটেরিয়াস-A' নামক super massive back hole অবস্থান করছে, যার অতীব মাধ্যর্ষণ বলের প্রভাবে পুরো গ্যালাক্সি তার চারিদিকে ঘূর্ণয়মান)।

তবে তাদের (টাইপ 3 সিভিলাইজেসন এর জীব দের) শক্তির চাহিদার স্থায়ী সমাধান হতে পারে যদি তারা মহাজগতের সবথেকে ভয়ংকর, রহস্যময় এবং বিষ্ময়কর বস্তুসমূহের একটি 'কোইজার' অথবা 'কোয়াসার' (কোয়াসি স্টেলার অবজেক্ট) এর শক্তি সংগ্রহ করতে পারে।

ভক্ত পদাবলী: নেহরু, চীন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ

লি খে ছে ন – অ নু জ বি শ্বা স



গালওয়ান উপত্যকা এবং ডোকালাম অঞ্চলের সীমান্ত সমস্যা প্রসঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেছেন "ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আমেরিকা। জওহরলাল নেহেরু সেটি না নিয়ে চীনকে দিয়ে দেন। তাই আজ আমাদের এতো খারাপ অবস্থা।"

পোষ্ট ট্রুথ সময়কালে দাঁড়িয়ে আজকের বিজেপি নেতারা পেট গজিয়ে যা বলে সেটি "ইতিহাস" হয়ে যায়। যেমন হঠাৎ একদিন সকালে বলে দিল যে "শ্যামাপ্রসাদ

মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করেছিলেন"। অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রাণ বীরেন শাসমল, নেতাজি সুভাষ, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, কিরণ শঙ্কর রায়, কালিপদ মুখার্জী, সতীশ দাশগুপ্ত, অজয় মুখার্জী, খগেন দাসগুপ্ত, লোকনাথ বল, সতীশ সামন্তদের মতো 10-15 বছর জেলে কাটানো সর্বত্যাগী "সন্ন্যাসী" স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আগে ট্রেন্ড করতে শুরু করে দিলেন "শ্যামা দা" .. যে শ্যামাদা ইউনিয়ন জ্যাক জড়িয়ে ধরে ঘুমোতেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকা কালীন ইউনিয়ন জ্যাক অমান্য করার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেত মারার হুকুম দিয়েছিলেন। এই শ্যামাদা 1941 সালে জিন্নার হাতে পায়ে ধরে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী তথা ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন (তখন রাজ্যের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত)। বাংলা ভাগের পক্ষে শ্যামাদা ভোট দিয়েছিলেন মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। মনে বড়ো বাসনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু যখন দেখলেন কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় তার কোনো জায়গা হবে না, মুখ্যমন্ত্রী হবেন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, উপরন্ত জহরলাল নেহেরুর দয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম শিল্প মন্ত্রী হয়েই থাকতে হবে তখন দেশভাগকে হাতিয়ার করে বলে বসলেন, "অখন্ড ভারত"।

লে হালুয়া।.. এখন তো আর দেশ জোড়া লাগানো যাবে না... এখন যত পারি অখণ্ড ভারত বলে চিল্লা-চিল্লি করি।

"... ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো। .. যেই ভেঙে গেলো, অমনি শ্যামাদা ডাক ছেড়ে বলে উঠলেন, "জোড়ো"... দেশীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য, বিরোধিতা করার জন্য ওনাকে বিরোধিতা করতেই হবে। আর বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্যামাদা এমন ভাবে রং বদলাবেন যে গিরগিটি অব্দি লজ্জা পাবে। যাই হোক, ১৯৫৩-তে dry pleurisy -তে শ্যামাদা পটল তোলার পরে 2019 সালে শ্যামাদা হঠাৎ বেঁচে উঠে এখন ঘোরাফেরা করছেন........"শ্যামা নামে লাগলো আগুন"।

এখন অমিত বাবু হঠাৎ বলছে যে, "ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার প্রস্তাব চীনকে দিয়ে দিয়েছিলেন নেহেরু।"

1955 সালে 27 শে সেপ্টেম্বর সংসদে নেহেরু কি বলছেন?

"ভারতকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়নি... যারা রটিয়ে বেরাচ্ছে তারা ভুল রটিয়ে বেড়াচ্ছে। .. ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে গেলে রাষ্ট্রসংঘের সনদ পরিবর্তন করতে হবে যে সনদের মাধ্যমে 1945 সালে স্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। .. সে সনদ পরিবর্তন করা এখন সম্ভব নয়... ভারত নিজের জোরেই একদিন রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করবে।"

তাহলে চীন ঢুকলো কি করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে 1949 সালে?

উঃ চীন 1949 সালে ঢোকেনি... ঢুকেছে 1971 সালে।

1971 সালের 15ই জুলাই, রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদের (General Assembly) 26 তম অধিবেশনে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের চীন সফর করে মাও জে দঙের সঙ্গে মিটমাট করে আসার পরে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতে আলবেনিয়ার নেতৃত্বে 17টি দেশ একযোগে Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations নামে একটি প্রস্তাব নিয়ে আসে, যেটা The United Nations General Assembly Resolution 2758 (Resolution on Admitting Peking) নামেও পরিচিত। এই প্রস্তাব থেকেই যত সমস্যার উদ্ভব হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধে চীন কে পাশে পাওয়ার জন্য 25 অক্টোবর 1971 সালে 76-35 ভোটে এই প্রস্তাব চীনের পক্ষে পাস করানো হয় এবং রাষ্ট্র সংঘে চীনের অনুপ্রবেশ ঘটে। যদিও আমেরিকার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই ঘটনার দুই মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে গিয়েও রাশিয়ার ভয়ে চীন ব্যাক গিয়ার দেয় এবং মাদাগাস্কার প্রণালী থেকে ব্রিটিশ নৌবহর ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। তথাপি ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্রমাগত ভয়াবহ পরিণাম, চীনের ভৌগোলিক অবস্থান এসব কারনে চীনকে যে কোনও মূল্যে

পাশে পাওয়ার জন্য নিক্সন গিয়েছিলেন মাও এর সাথে সেটিং করতে।

সেকি? এ তো নতুন কথা। .. তাহলে 1949 থেকে 1971 পর্যন্ত কি হয়েছিল?

উঃ নাম নিয়ে বিবাদ। এই বিষয়টা একটু বিশদে জানা দরকার।

1912 সালের জানুয়ারি মাসে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটিয়ে সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম Republic of China প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ 1912 থেকেই চীন একটি স্বাধীন দেশ। 1917 সালে ব্রিটেনের নেতৃত্বে চীন মিত্র বাহিনীর পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় এবং ইংরেজদের স্বাভাবিক মিত্র (Natural Ally) হিসাবে কাজ করে। 1945 সালের 26 জুন রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় যে 51টি দেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে সনদে স্বাক্ষর করে তাদের মধ্যে অন্যতম এই Republic of China, আমাদের দেশেও ছিল কিন্তু স্বাধীন দেশ হিসাবে নয়, ব্রিটিশ ভারত হিসাবে আর চীন ছিল স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে। কিন্তু যখন রাষ্ট্র সংঘের স্বপক্ষে অনুসমর্থন বা Deposit of Ratification দেওয়ার সময় আসে তখন তৎকালীন চিনা প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইসেক তা জমা দেন 28 সেপ্টেম্বর 1945 এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো, যুদ্ধোত্তর দেশের পুনর্গঠনের অজুহাত দেখিয়ে Deposit of Ratification

জমা করেন 30 অক্টোবর 1945.... স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে চীন ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ১৯৪৫ সালে করা হয় Republic of China (ROC) কে, তখন সেই দেশের প্রধান ছিলেন চিয়াং কাই শেক এবং ওই ROC ছিল বর্তমান চীন ভূখণ্ডই। 1945 সালে যে পাঁচটি দেশ রাষ্ট্র সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী এবং ভেটো ক্ষমতাধারী সদস্য (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীন) তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী কোনও পরাধীন অথবা যুদ্ধপরাধী দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ভেটো প্রদানকারী সদস্য হতে পারে না। তাই জাপান, জার্মানীর মত দেশ যুদ্ধপরাধী বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যতা লাভ করে অনেক পরে। ভারত স্বাধীন হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৃষ্টির আরো 2 বছর পরে আর ততদিনে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংবিধান সংশোধনের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে কারনেই, আজ অবধি ষষ্ঠ কোনও দেশ এই গ্রুপে ঢুকতে পারেনি।

১৯৪৯ সালে মাও যে দঙের নেতৃত্বে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং কে পিটিয়ে তাইপেতে পাঠিয়ে দেয়, যেটির নতুন নাম হয় তাইওয়ান এবং সেই নতুন দ্বীপরাষ্ট্রের নাম হয়, Republic of China (RoC) ... আর মূল চীন ভূখণ্ডের নাম হয় Peoples Republic

of China (PRC) ... মাও যে দঙের নেতৃত্বে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্য হিসাবে তো UN charter অনুযায়ী জ্বলজ্বল করছে ROC.. সেটা তাহলে এখন কারা? মূল ভূখণ্ড না তাইওয়ান? শ্যাম রাখি না কুল রাখি? চিয়াং কাই শেককে রাখি? না চীনের মূল ভূখন্ডকে রাখি?

এবারে এই দুটোর দেশের মধ্যে কোন দেশটি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে? আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে থাকে, তাইওয়ানই স্থায়ী সদস্য হওয়ার উপযুক্ত। কমিউনিস্ট রাশিয়া সমর্থন করতে থাকে চীনকে।

দুটো দেশকেই কেন একসঙ্গে সদস্য করা যাচ্ছিলো না?

ROC এবং PRC কেউ কারুর অস্তিত্ব মানছিল না এবং আজও মানে না... দুজনেই বলছিল তারাই মূল ভূখণ্ড এবং তাইওয়ানের শাসক। .. কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমী দেশগুলোও PRC কেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য মানতে শুরু করে যখন ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে চীন – সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। আমেরিকা সেই সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। তাইওয়ানকে বিশেষ কিছু ব্যবসায়িক সুবিধা দিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ডকেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হয় সোভিয়েতকে কোনঠাসা করতে। এর পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে ঠান্ডা

যুদ্ধ। যদি আমেরিকার সাথে ইউরোপের কোনও দেশের ঠান্ডা যুদ্ধ লাগতো তাহলে কেউ চীনের দিকে ফিরেও দেখতো না। কিন্তু সংঘর্ষ বাধলো রাশিয়ার সঙ্গে। এক্ষেত্রে চীনের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের শোচনীয় অবস্থা, তার উপরে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সীমান্ত সংঘর্ষ। অর্থাৎ শত্রুর শত্রু মানে আমার বন্ধু। এই ফর্মুলা মেনেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের চীন সফর করে মাও জে দঙের সঙ্গে মিটমাট করে আসার পরে আমেরিকার ইশারায় আলবেনিয়ার নেতৃত্বে 17টি দেশ একযোগে Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations নামক প্রস্তাব উত্থাপন করে যা The United Nations General Assembly Resolution 2758 (Resolution on Admitting Peking) নামেও পরিচিত। ভোটাভুটিতে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে সরকারী ভাবে জানানো হয়, "Recognising that the representatives of the Government of the People's Republic of China are the only lawful representatives of China to the United Nations and that the People's Republic of China is one of the five permanent members of the Security Council.

Decides to restore all its rights to the People's Republic of China and to recognise the Representatives as the only legitimate representative of China to the United Nations, and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from its place..."

1976th plennary meeting, dtd. 25 October 1971.

তাহলে নেহেরু আসছেন কোথা থেকে?

উঃ 1949 সালে নেহেরু নিজের মতামত দিয়েছিলেন যে দুই চীনের মধ্যে একজনকে যদি করতেই হয়, তাহলে পুঁচকে দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ানকে না করে জনসংখ্যার কারণেই মূল চীন ভূখন্ডকেই অর্থাৎ PRC কেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করা হোক। এটা সম্পুর্নভাবে নেহেরুর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ।

কিন্তু আমেরিকা তো ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল?

উঃ কোনো সরকারি প্রস্তাব আসেনি... কেনেডির মতো কেউ কেউ মনে করতেন যে গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতেরই রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়া উচিত। .. কিন্তু সেক্ষেত্রে UN charter বা রাষ্ট্রসংঘের সনদ পরিবর্তন করতে হতো। আমেরিকা চাইলেই হতো না, সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগ করে আটকে দিতে পারতো।

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম আমেরিকার গায়ের জোরে ভারতকে স্থায়ী সদস্য হওয়ার আহ্বান জানালো, তাহলে তো রাষ্ট্রসঙ্ঘের নথিতে সেসব উল্লেখ থাকতো। এমন কোনও নথি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাফেজখানায় পাওয়া যায় নি। যদি এমন কিছু ঘটতো তাহলে তার নথি অবশ্যই থাকতো। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোনো NDA সরকার নয়, যাদের সব কিছুতেই No Data Available থাকে।

তাহলে নেহরুর রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার তথ্যটি মিথ্যা?

উঃ ওই "শ্যামা দা"-র হঠাৎ করে মৃত্যুর 66 বছর পরে "পশ্চিমবঙ্গের রূপকার" হয়ে যাওয়ার মতো "সত্য "... "স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে গল্প " করতে করতে শ্যামাদা হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গকে কখন যে টেনে ভারতে নিয়ে এনে ফেললেন, অন্ধভক্তরা ছাড়া কেউ ধরতেই পারলো না। নেহরুর রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্যপদ চীনকে দিয়ে দেওয়ার গপ্পটিও অমন "শ্যামাদা"-র গপ্পের মতোই whatsapp university তে লেখা হয়েছে। কিভাবে লেখা হয়েছে সেকথা জানতে গেলে কিন্তু নিজের মগজাস্ত্রটি গোয়াল ঘরে জমা রাখতে হবে।।

অনুজ বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগে কর্মরত।
ইমেল: anuj.biswas.dop@gmail.com,

বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞানচর্চা, কুসংস্কার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভুমিকা

লিখেছেন – চার্বাক কাজী



বিজ্ঞানসম্মত প্রামান্যতার পরিবর্তে ছদ্মবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণাকে পোষণ করা,

আচারের নামে সেই সব গোঁড়ামিকে লালন করা এবং অন্ধত্বের সাথে অনুসরণ করার নামই কুসংস্কার।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চাই বিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের সম্যক অনুধাবন ও বোধগম্যতা। সংজ্ঞা বিচারে: – বিজ্ঞান হচ্ছে বস্তুজগতের নিয়মকে বুঝবার একটি সমন্বিত মানবিক প্রচেষ্টা। সে লক্ষ্যে ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান।

– বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে যুক্তি ছাড়াই অমূলক ব্যাখ্যা দেয়াটা হচ্ছে অপবিজ্ঞান; অমূলক ধ্যান ধারনাকে বিজ্ঞানের নামে চালিয়ে দেয়া। যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্র বা অ্যাসট্রোলজি, সংখ্যাতত্ত্ব বা নিউমেরোলজি বা অশরীরী আত্মা ও প্রেতাত্মা বা ভূত-প্রেত-জ্বিন ইত্যাদি। ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহ'র ধারনা এই অপবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে, কারন ঐশী এক সত্ত্বায় আস্থা রাখার প্রবণতাটি ব্যক্তিকে বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে দূরে সরিয়ে অলৌকিকত্বের ধারনায় আস্থাশীল করে তোলে।

– নিছক কোন উক্তি, বানী, বা মন্তব্য কে মনের মাধুরীতে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সমন্বিত করার নাম হল ছদ্মবিজ্ঞান। সাধারণত প্রাচীন পুঁথি, পুরাণ, পৌরাণিক গল্প ও প্রচলিত গল্প থেকে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন

বের করে বিজ্ঞানের আলোকে সেটাকে মুড়ে অলৌকিকত্বের নিদর্শন হিসেবে চালানোটাই হচ্ছে ছদ্মবিজ্ঞান। কুরানে বেগ্যান, ব্যাদে বেগ্যান সেগুলোরই নিদর্শন। অশিক্ষিত সমাজে এই ধারা বেশ সাড়া পায়।

অলৌকিকত্বের জন্মই হয় পরিপূর্ণ তথ্যের অভাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আপাত দৃষ্টিতে লৌকিক নিয়মের বিপরীত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়ে ব্যাখ্যা যোগ্য নয় ও বুদ্ধির অগম্য থাকে, ততক্ষণ সেটাতে ঐশী শক্তির সরাসরি তত্ত্বাবধান পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু যে মূহুর্তে সেটা পরীক্ষাযোগ্য ও ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে ওঠে, ঐশী শক্তি সেখান থেকে লুপ্ত হয়। অপ্রমানিত অস্তিত্ব বলেই প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ধার্মিক বা নিধার্মিক কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; ফলে সেটা হয়ে ওঠে বিশ্বাসজনিত ভাবালুতা ও ব্যক্তিগত অনুভূতি। আর বিশ্বাসের কোন যুক্তি কখনই থাকে না, যুক্তি আর বিশ্বাস চিরকালই পরস্পর বিরোধী, কারন সম্যক অনুধাবন ও বোধগম্যতার জন্য জরুরী যুক্তি। চিন্তার ক্ষমতা মানুষের অন্যতম গুন। আর এই চিন্তাকে সুসংহত ভাবে ভাষায় ব্যক্ত করার বৈজ্ঞানিক ধারা হল যুক্তি; অলৌকিকতার পরিবর্তে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আলোচনায় যুক্তিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণের নীতি হচ্ছে যুক্তিবাদীর সম্যক পরিচয়।

যৌক্তিক চিন্তার বিপরীতে যাদু, ইন্দ্রজাল, মায়াবিদ্যা, গুপ্ত শক্তি, ভোজবাজি, অলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক সমাধান যখন মানুষের জীবনে প্রাধান্য পায়, তখন সেটা প্রগতির বিরুদ্ধাচারন করে, তখন সেটা হয়ে ওঠে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা দিবাস্বপ্ন বা ভাবাবেশ বা আজগুবি কল্পনা বা ফ্যান্টাসি যা চিন্তা ও মননকে বিকশিত করার পরিবর্তে ঠেলে দেয় অন্ধ বিশ্বাসের পথে। ধর্মগুলো ঐন্দ্রজালিক সমাধানে বিশ্বাস করে বলেই ধর্ম হচ্ছে মুলত রুপকথা ও ফ্যান্টাসির জগত; আর সেজন্যই ধর্মে বিশ্বাসও মানব সভ্যতার জন্য নেতিবাচক।

রূপকথা হল সংক্ষিপ্ত কাল্পনিক গদ্য বা পদ্য, যা সাময়িক ভাবে আনন্দদায়ক ও মজার, কিন্তু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বা সে ধরনের অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করে বলে অত্যন্ত অভাবনীয় সব বিবরণে পরিপূর্ণ। রূপকথাগুলোতে প্রায়শই বিভিন্ন কাল্পনিক প্রাণী এবং তাদের অবিশ্বাস্য, অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর ঐন্দ্রজালিক সমাধানের বর্ণনা পাওয়া যায়। রূপকথার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই গল্পগুলো মানুষের মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়ায়।

ঈশ্বর ধারনার মতই রূপকথা সদৃশ ধর্মগুলোও দাবি করে নিরবিচ্ছিন্ন দৃঢ় বিশ্বাস। সেটাই আর অস্তিত্বের ভিত্তি, আর সেকারনেই প্রশ্ন বা সংশয় নিয়ে তাদের রয়েছে প্রবল আপত্তি, কখনও অনুভুতির মায়াকান্নায়, কখনও বা

সহিংসতায় প্রশ্নকারীর কণ্ঠরোধেই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

বিজ্ঞান মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস দাবি করেনা; বিজ্ঞান দাবি করে বোধগম্যতা। বিজ্ঞান দাবি করে বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান চর্চা।

বিজ্ঞানচর্চা আর বিজ্ঞানমনস্কতা সমার্থক নয়; যদিও উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজ্ঞানচর্চা হলো শুধুমাত্র প্রাযুক্তিক জ্ঞানের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিস্ট দক্ষতা অর্জন; পক্ষান্তরে বিজ্ঞানমনস্কতা হলো বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধশক্তিতে সংস্কারমুক্ত ভাবে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা সমালোচনামূলক চিন্তাধারায় দক্ষতা অর্জন। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর জন্য প্রয়োজন হয় সচেতনতার, যার চরিত্র স্বতঃপ্রণোদিত, সুশৃঙ্খল, স্বসংশোধনমূলক। সচেতন চর্চার অর্থ হচ্ছে মুলত জ্ঞানার্জন, অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের মাধ্যমে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ অনুভুতির বিজ্ঞানমনস্ক অনুধাবন, উপলব্ধি ও প্রয়োগ।

ধর্মাশ্রয়ী বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে আজ প্রচলিত বহুবিধ কুসংস্কার, যার ফলে যুগ যুগ ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ অঞ্চলেরই মানবগোষ্ঠী, এবং তা কেবল স্বল্পশিক্ষিতদের মাঝেই নয়, বরং তা গেঁড়ে আছে সমাজের সর্বস্তরেই। জীবনাচারে কুসংস্কার মুক্ত হতে না শিখলে, এই ভুল ধারণাগুলোর মূলোৎপাটন অসম্ভব; অসম্ভব একটি

প্রগতিশীল সমাজে পরিনত হওয়া। আমাদের ধর্মপ্রভাবান্বিত পারিবারিক শিক্ষায় এবং ধর্মমোহের সাথে আপোষকামী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তিবাদীতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার বিষয়গুলো আজ প্রবল ভাবে অনুপস্থিত ও উপেক্ষিত।

ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর চাইতেও রাষ্ট্রের ভুলটা এক্ষেত্রে আরও বড়। কেন এই ২০১৪ সালেও রাষ্ট্রের উদ্যোগে একটি অদ্ভুত, প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে যা মানুষকে মানবিক না করে প্রতিনিয়ত আরও ধর্মমুখী করে তুলছে? কেন এই শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রসর চিন্তাকে উৎসাহিত না করে অতীতমুখিনতা ও রুপকথায় বিশ্বাসকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যখন সমাজ বিকাশে সত্যিকার অর্থে জরুরি হলো যুক্তিবাদী হতে পারা; চিন্তা, চেতনা, মনন ও আচরনে শিক্ষিত, সভ্য, বিনয়ী, সংস্কৃতিবান ও মননশীল হতে পারা; বিজ্ঞান মনস্ক হতে পারা, অসাম্প্রদায়িক হতে পারা।

ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে কেন একটি রাষ্ট্রধর্ম থাকবে? কেন এই রাষ্ট্র ধর্মকে নিয়ে সমালোচনামুলক কোন লেখাকে অপরাধ মনে করবে? কেন ধর্মানুভুতির মত খেলো একটি বিষয়কে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মহল গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে? কেন রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মানুভুতিকে নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ পাবে?

রাষ্ট্রের এই দ্বিচারিতার মুখোশ উন্মোচন এবং দ্বৈতনীতির অবসান আশু প্রয়োজন।

muktomona blog

"একটি ধ্রুবক বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তিকে সম্মোহনের মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। একজন প্রেমিক যে ক্রমাগত নিজের প্রেমিকার কথা চিন্তা করে সে অনুভব করে যে সে আসলে তার সাথে দেখা করেছে। যারা আন্তরিকভাবে নিজেদের দেবতার সাথে সাক্ষাতের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং এর জন্য বিভিন্ন তপস্যা করে, তারা সহজেই অনুভব করতে পারে যে তাদের দেবতা আসলে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুর অনুগ্রহই যে একজনকে তার ঈশ্বরের সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারে সেই ব্যাপারে গভীর বিশ্বাসের কারণে একজন ভক্ত তার গুরুর পরামর্শে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে দেখার বিভ্রমের শিকার হয়। এই সবকিছুর ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত একটা কথা বলা যেতে পারে যে এগুলো আসলে মনের একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় অনুভূত অভিজ্ঞতা, যে অবস্থাকে বলা হয় সম্মোহন।"

- নরেন্দ্র দাভেলকার



বিজ্ঞান ও ধর্ম

লিখেছেন – শুভ্র সরকার

আপনি যে কাগজের উপর ছাপানো অর্থৎ বই আকারে আপনাদের কোরান, গীতা, বাইবেল পরেন সে বই, কাগজ, কালি, ছাপানোর ম্যাসিন, ছাপাখানাটি কে আবিষ্কার করেছে তা কি জানেন?

কাগজ আবিষ্কার করেন চীনারা। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ বছর আগে চীনারা কাগজ আবিষ্কার করে, সেই কাগজ সারাবিশ্বে রপ্তানি করতেন। আপনার ঐ ধর্মীয় পুস্তকটিতে সেই কাগজই ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাইরে কোন ঐশ্বরিক বস্তু এতে ব্যবহৃত হয়নি। তাই ধর্মগ্রন্থ নিজেই কি বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হলোনা?

♦আপনি যে ধর্মগ্রন্থটি পড়ে এতসব ধর্মীয় নিয়ম নীতি আওরান, ঐ পুস্তক বা বইটি তৈরি হয়েছে একটি ছাপাখনায়। আর ছাপাখনাটিও বিজ্ঞানের অবদান। ঐ ছাপাখানা ও বই কে কে তৈরি করেছে জানেন?

১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির মেনাজ শহরে ছাপাখানা আবিষ্কার করেন গুটেনবার্গ। এবং ইংরেজি ভাষায় ইংল্যান্ডে প্রথম গ্রন্থ মুদ্রন করেন উইলিয়াম ক্যাক্সটন।

♦শুধু কাগজ আবিষ্কার, ছাপানোর যন্ত্র ও বই ছাপানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবনেই কিন্তু আপনার ধর্মগ্রন্থটি তৈরি হয়ে যায়নি। এতে উপযুক্ত মানের কালিরও দরকার হয়েছে। আর উপযুক্ত মানের কালি মানে তৈলাক্ত কালি। যা ছাড়া আপনার বই ছাপালে সেই কালি অল্প ঘষাতেই উঠে যেত। তাই প্রথম তৈলাক্ত কালি তথা লিথোগ্রাফি প্রযুক্তির আবিষ্কার করেন জার্মান অভিনেতা অ্যালোয়িস সেনেফেল্ডার।

♦এবং এখানেই শেষ নয়। এই ছাপাখানা মানুষের চাহিদা মিটাতে পারছিলোনা। তাই এক সময় এই ছাপাখানাও অচল হয়ে যায় আধুনিক ছাপাখানার বদৌলতে। এটি করতে হয় মানুষের প্রয়োজনে। আর আধুনিক ছাপাখানা আবিষ্কার করেন ইংল্যান্ডের রবার্ট বাকলে।

♦এবার আশি একটু কলমের কথায়। কারন কলম ছাড়া আপনার আমার লেখা পড়া'র 'ল' ও হতোনা। মানুষের এ প্রয়োজন বুঝে কলম আবিষ্কার করেন ওয়াটার ম্যান। অবশ্য এটি ছিলো ফাউন্টেন পেন। কলমের পরেও

আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন মানুষ খুব বোধ করে। আর তা হলো পেন্সিল। আর পেন্সিল আবিষ্কার করেন রোমানরা।

♦এবার আশি বলপয়েন্ট কলমের কথায়। যার প্রথম পেটেন্ট করেছিলেন জন জে. লাউডকে ১৮৮৮ সালের ৩০ অক্টোবর। আর বলপয়েন্ট পেন এখন সবার মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে ফাউন্টেন পেন আর দেখাই যায়না।

♦তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাই? আপনার ধর্মপুস্তক বিজ্ঞানের কাছে প্রতিপদক্ষেপে ধরা খেয়ে বসে আছে। ধর্মপুস্তক পড়ার আগে বিজ্ঞানকে একশতবার প্রনাম করে আসতে হয় আপনাকে। কারন বই বানানোর এই এতোগুলো পদ্ধতির মধ্যে কোথাও কি কোন ধর্মান্ধদের হাত দেখতে পেলাম আমরা! কোথাও পাইনি। অথচ ধর্মান্ধরাই মানুষের জীবনকে বিভীষিকাময় করে রেখেছে আজীবন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধর্মের জঞ্জাল জীবনকে এক পা এগুলে যেন একশত পা পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। আর এই মানুষের প্রয়োজনে মানুষ যে আবিষ্কার গুলো করেছে সে আবিষ্কারগুলো ব্যবহার করেই তো ধর্মান্ধরা এখন তাদের তথাকথিত শিক্ষা দীক্ষা পরিচালনা করছে। এমনকি কেউ আছে বই, কাগজ, কলম, কালি ছাড়া তাদের শিক্ষা দীক্ষাকে একটুও এগিয়ে নিতে পারবে! তাহলে সবাইকেইতো বিজ্ঞানের কাছে নতজানু হতেই হয়। বিজ্ঞানের কাছে এত নতজানু হওয়ার পরেও যে মানুষেরা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার কথা বলে তারা

যে কত বড় ধর্মীয় সেবক সেটা বুঝতে আর কারো কাছে কি যাওয়ার প্রয়োজন আছে!

♦এবার ভাষার কথায় আশা যাক। ভাষার মাধ্যমে এই যে ভাবের বিনিময়, কথার আদান প্রদান, সেটাকে দেখা হয় বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হিসেবে। সবকিছুকে বদলে দিয়েছে এই ভাষা।

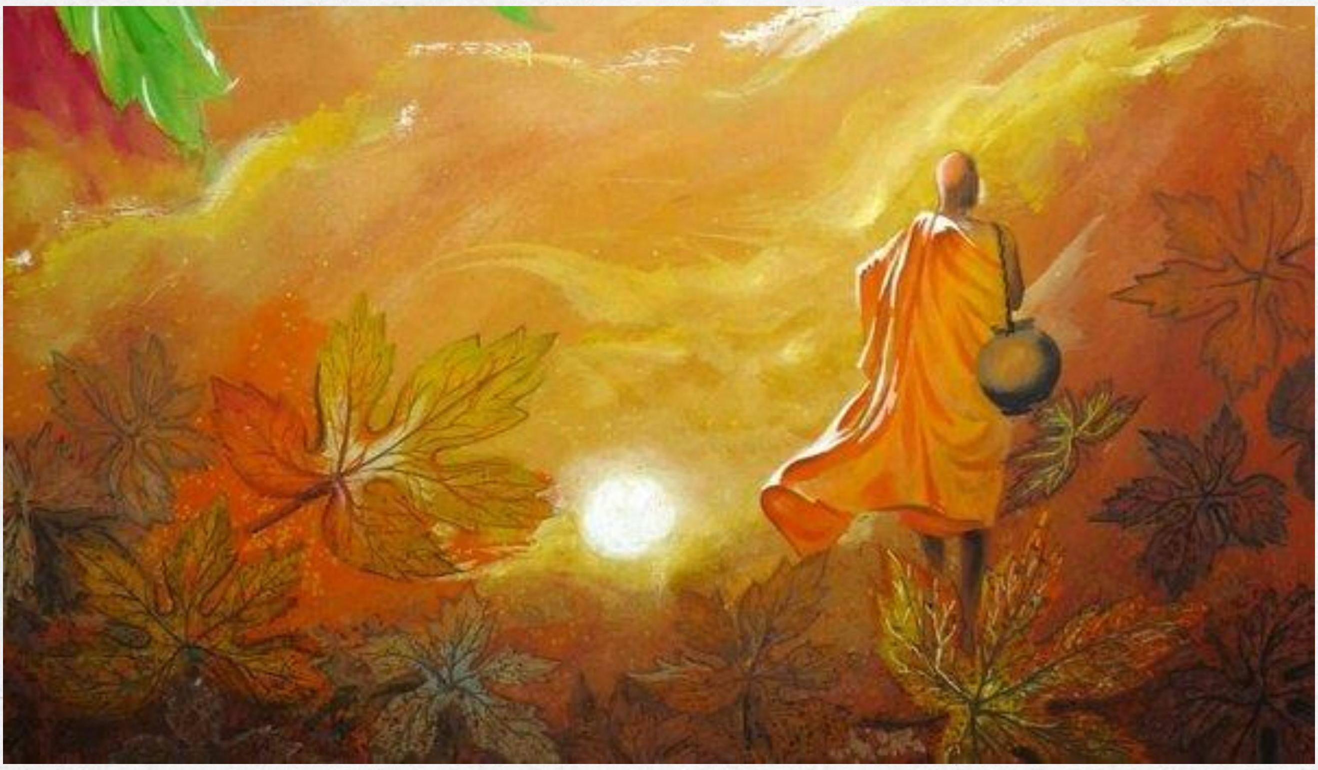
"জটিল যতো বিষয় আছে তার একটি এই ভাষা এবং এটিই আমাদের মানুষ বানিয়েছে, বলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব বিবর্তন বিভাগের শিক্ষক ও নৃবিজ্ঞানী রবার্ট ফোলি। তাই ভাষাতো আর কোন ঈশ্বর বানিয়েছে একথা কেউ বলেনি। ভাষাটি আবিষ্কার করা কোন ধর্ম প্রবর্তকের পক্ষে বহুবছর চেষ্টা করেও সম্ভব নয়। দু'একজন ওয়াজকারী অবশ্য এমন দাবিও করে বসেন মাঝে মধ্যে। আচ্ছা ভাষা যদি ঈশ্বর তৈরি করে দিয়ে না থাকে তাহলে সে কেমন ঈশ্বর যে আমাদের তৈরি ভাষায় উনাকে ডাকতে বলেন!

তাই এখন একথা বলাই যায় যে এইসব কিছু আবিস্কার হওয়ার পর ধর্ম প্রবর্তক বা প্রচারকেরা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন এসব তাদের বাপ-দাদাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। আজ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি কারি এই মানুষগুলো শুধু গুজব ও গজব ছাড়া ভালো কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।

এই গুজব ও গজবের আবিস্কারকরাই নিজেদের মহাজ্ঞানী ভাবে।

যুক্তিবাদীর খোঁজে

লিখেছেন – মহম্মদ মহসীন



বয়স তাঁর ৭৫, কবিতার আসরে একটি কবিতা শোনালেন। মুক্তমনের কবিতা। বক্তব্য, পৃথিবীতে অনেক অনেক দেশ আছে, যেখানে লক্ষ্মীপুজো করা হয় না কিন্তু ব্যবসায়ে তারাই অনেক এগিয়ে অনেকানেক দেশ আছে যে দেশের অনেকে সরস্বতীর নামই শোনেনি, কিন্তু তারাই শিক্ষায় জ্ঞানে বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে পথ দেখাচ্ছেন সারা বিশ্বকে। পুজোর নীটফল আসলে শুন্য।

প্রার্থনার ভরসায় না থেকে, সেই সময়টাতে কায়িক বা মানসিক উৎপাদনাত্মক কাজ করার সুপরামর্শ বিষয়ে কবিতা। বৌদ্ধিক বিকাশে পুজো-আচ্চার সার-শুন্যতাই তাঁর কবিতার উপজীব্য-কেন্দ্র। পাঠশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ একটা অন্য রকম চিন্তা ভাবনা। তাই নয় কি?

বুঝলাম, জীবনের ৭৪-টি শরৎ-আঁধার পার করার পর তাঁর মাঝে এই সু-বোধ এসেছে। মুক্তচিন্তনের জানালা খুলে মুক্তির বাতাসের বার্তায় কান রাখার সন্ধিক্ষণ এসেছে তাঁর জীবনে। তিনি নতুনের পেয়েছেন সন্ধান, সত্যের আলোয় দিশা পেয়েছেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। এগুলি খুবই ভাল কথা, আশার কথা। এই আশার কথা নিয়েই আজ দুটো কথা লিখি। মুক্ত চিন্তনের পরিসর করে দেওয়া আমাদের দায়। তাঁর কাছে যাওয়ার কথা ছিল আমার, দেবরাজের আর অনির্বাণের। উনিই একদিন চলে এলেন আমার বাড়িতে। অনেক কথা হলো। ভাল লেগে গেল ৭৫ বছরের এই যুবকটিকে। তাঁর মাঝে যুক্তিবাদের এই উন্মেষকে প্রত্যক্ষ করেই এবারের চেতনায় লেখার বিষয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, দ্বীপে শুধু আমরা কয়েকজনই নেই, আমাদের সমমনস্কের প্রসারতার মহাবিশ্বে অনেকেই আমাদের আজো অজানা, আজো

অজ্ঞাত। আজ তাই আমাদের আশার কথা নিয়েই এক কলম লেখার প্রয়াস।

দ্বিতীয় জনকে যেমন দেখেছি:

ইনি একজন রাজমিস্ত্রী। কাজ করছিলেন আমাদের বাড়িতে। লেখাপড়া ঐ ক্লাস নাইন কি টেন পর্যন্ত। কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা কথার উল্লেখ না করলেই নয়। নিয়মিত লাইব্রেরী যান। রাত্রে বই পড়েন; শরৎ থেকে শরদিন্দু সব। আগাথা ক্রিস্টি, হ্যাডলি চেজ, ডিকেন্স, রবীন্দ্রনাথও তার পছন্দের লেখিকা-লেখক। জীবনানন্দও পড়ে ভাল লাগে। জিজ্ঞেস করলাম, প্রবীর ঘোষ বা ভবানিপ্রসাদ সাহুর বই পড়েছেন? বললেন, এই দুইজনই তাঁর অত্যন্ত পছন্দের লেখক। হাল আমলের তসলিমাও তাঁর আগ্রহের ভিতরেই। একবার আমাদের ধনিয়াখালী সুরভি পাঠাগারের সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। বয়স ঐ রকমই অর্থাৎ মধ্য সত্তর। তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ্য, ডোম, হাড়ি, শুঁড়ি এসব জাতপাত মানেন না। বেদ পুরাণ হ'ল ব্রাহ্মণদের বানানো গ্রন্থ। ধর্মের কঙ্কাল তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে বেশ ধরা পড়ে। নিরীশ্বরবাদী না হলেও,

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের কাঠামোটির অনেকটাই চিনে নিয়েছেন।

চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন কয়েকজন শ্রমজীবি। গান বাজছিল, "শত জনমের, কত সাধনায়, পেয়েছি মানব প্রাণ।" শুনে একজন অকপটে দ্বিধাহীন উচ্চৈস্বরে বলেন, গানটাতে ভুল বলছে, একেবারেই ভুল বলছে। জীবন একটাই। জন্ম একটাই। আগের জন্ম, পরের জন্ম, ওসব একেবারেই ধাপ্পাবাজি।

আমি সেখানেই ছিলাম। বেশ অবাক হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিভাবে বুঝলেন জন্মান্তর নেই? উনি উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি দাবী করছেন জন্মান্তর বলে কিছু আছে? তাহলে আপনিই আপনার কথাটার প্রমাণ দিন। সত্যি অবাক হয়েছিলাম তাঁর এই যুক্তিশীল মানসিকতায়।

এক খ্যাতনামা জ্যোতিষীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, দেখো, আগে তো নিজের জীবিকা। জ্যোতিষ প্র্যাক্টিস করে উপার্জন আমাদের দেশে সম্মানের পেশা। তবে তুমি যেটি বলতে চাইছ, তাতে আমিও পূর্ণ সহমত। আমি তো বিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা পড়েছি। তাতেই বুঝলাম, জ্যোতিষে বিজ্ঞানের

কোনোকিছুই নেই। লোককে বিজ্ঞানের নামে ধাপ্পা না দিলে কিছু শিক্ষিত লোককে আমাদের আঙিনায় আনা যায় না।

এক ওঝা। আঁকিবুঁকি এঁকে, গুনে, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তেলপড়া, জলপড়া দিয়ে ভূত তাড়ান। বাড়ির দোষ কাটান। একান্তে স্বীকার করেছিলেন, ভূত, প্রেত, বলে কিছুই নেই। তাঁর অভিজ্ঞতায় এগুলো খেটে খাওয়া, কোথাও এতটুকু আলো-না-পাওয়া সমাজের অন্ধবিশ্বাস। সেই অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করেই আমাদের এই উপার্জন। মন সায় দেয় না। কিন্তু এ কাজে নাম হয়ে গেছে। পুরাতন পেশা। ছাড়ার কথাই চিন্তা করি না। কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং আমার ছেলে যখন লেখাপড়া শিখে বেকার জীবন কাটাচ্ছিল। তাকে চাকুরির ব্যবস্থা ধ্বংস করে, কোটি টাকার পাহাড় জমাচ্ছিল নেতা-মন্ত্রীরা, দুটো টাকার জন্য হতাশায় ভুগছিল, সুইসাইড করতে যাচ্ছিল। তখন সেই অবস্থায় তাকে এই পথে আসার জন্য উৎসাহিত করি। এখন সে মাসে মাসে সম্মানজনক আয় করে থাকে। আর দেখবে, পয়সা না থাকলে তার কোনো জায়গাও নেই এই পৃথিবীতে।

সাথী, আজ আমি এইসবের মধ্য দিয়ে দুটি বিষয় বুঝলাম।

এক, যুক্তিবাদ সকলের মধ্যেই আছে, সামাজিক আচার সেই যুক্তিমনস্কতাকে চাপা দিয়ে রেখেছে। কখনো আপন সত্তায় তা কোথাও কোথাও প্রস্ফুটিত হয়েও চলেছে। তবে সমর্থনের অভাবে, অভিঘাতের প্রভাবে, সম্পূর্ণভাবে তার প্রস্ফুটন ঘটতে পারছে না। উপরের যাঁদের কাছে আমি সরাসরি জানতে চেয়েছি, ঈশ্বর আছে কি না, তার উত্তর পেয়েছি, "কেউ একটা, কিছু একটা আছে।"

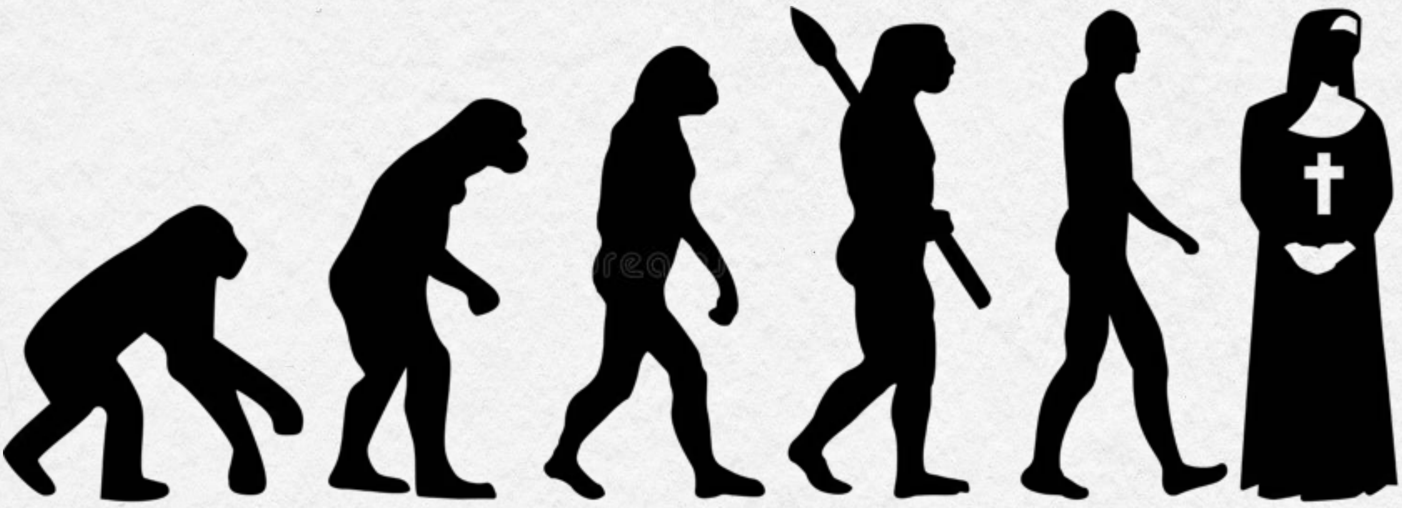
এবং

দুই, পেশার কারণে অবৈজ্ঞানিক বুঝলেও সেই পেশাকে গ্রহন করে জীবিকানির্বাহ করতে হচ্ছে। অনেক হোমিও ডাক্তার আছেন, যিনি নিজের চিকিৎসা করান মর্ডার্ণ ট্রীটমেন্ট ব্যবস্থায়। অবৈজ্ঞানিক বুঝলেও সেই পেশা নিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো অনেককে বাধ্য করে অবৈজ্ঞানিক জীবিকা বেছে নিতে। আমার দেখা এই জ্যোতিষিটি একান্তে স্বীকার করেন, এটা একটা ব্যাবসায়। জাতকের জীবনশৈলী দেখেই ভূত-ভবিষ্যত বলতে হয়। মামলা-মোকদ্দমা, প্রেম, সন্দেহ, বেকারত্ব, প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতা, সন্তানের লেখাপড়াজনিত হতাশার

সমাধানের আশায় ছুটে আসেন তাঁরা। তাঁদের এই হতাশা, দুর্বলতাই জ্যোতিষীর মূলধন।

মানুষ তো আসলে এক র‍্যাশানাল এ্যানিমাল, তার মাঝে যেমন এ্যানিম্যালিটি আছে, তেমনই তার মাঝে র‍্যাশানালিটিও আছে। কিন্তু ঐ যে স্বার্থান্বেষী সমাজে ধর্মধ্বজীদের বানানো এক জগদ্দল পাথর মানুষের এই যুক্তিবাদী মননকে চাপা দিয়ে দমিয়ে রেখে এসেছে, আসছে। তবু শাশ্বত প্রকৃতিকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা কৃত্রিমের থাকতে পারেনা। তাই নিকষ আঁধারের দুর্ভেদ স্থুল-বেধ প্রাচীরকেও ভেদ করতে পারে যুক্তিবাদের আলো। তার প্রকাশই আমরা পাই জীবনের আবশ্যিক ডাইমেনশন বা মাত্রাগুলিতে।

স্বার্থান্বেষীদের ভারী ভয়, যুক্তিবাদের মশাল যাঁরা বহন করে চলেছেন, তাঁদেরকে ভীষণ ভয়। তাই তারা মুক্তমনাদের খুন করে কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা জারি রেখে চলেছে। পারছে কি?



বিশ্বাসে বিষ

লি খে ছে ন – শ ম্ভু না থ চা র্বা ক

১ম - তুই ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিস?

২য় -হ্যাঁ, অবশ্যই অবিশ্বাস করি, থাকলে সামনে আবির্ভূত হন বিশ্বাস করে নেব।

১ম - দেখ, ঈশ্বর ছাড়া এই মহাবিশ্বের কল্পনাও করা যায় না।

২য় - দেখ, একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না এটা কিভাবে যাচাই হবে? আমরা কিভাবে জানবো সে সময় একমাত্র ঈশ্বর অস্তিত্বশীল ছিলেন? অথচ মহাবিশ্ব মহাকাশ কিছুই ছিল না?

হ্যাঁ এটা সত্য যে আজকের মহাবিশ্ব মহাকাশ সৌরমণ্ডল নীহারিকা তারকার সর্বদা অবস্থিতি ছিল না, মহাবিশ্ব এক্সপ্যান্ড করেছে যাকে সুপারনোভা বলছেন বিজ্ঞানীরা। এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল।

১ম—দেখ, সে সব প্রমাণ না দেখাতে পারলেও বলবো ঈশ্বর ছিলেন আছেন।

২য় - ঈশ্বরের কি কাজ? কেন ঈশ্বর আছেন? তাঁর থাকাতে কার কার কি কি উন্নতি হয়েছে? আর না থাকাতে কার কার কি কি ক্ষতি ঘটেছে?

১ম - দেখ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। ঈশ্বর তর্কের জিনিস নয় সম্পূর্ণ ভক্তিভরে বিশ্বাসের জিনিস।

২য় - আচ্ছা বলতো সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এখনও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারায়নি, আমাদের গুটি কয়েক নাস্তিকের কথা বাদ দে। তাহলে ঐ কোটি কোটি ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষেরা চরম দুর্দশায় ভুগছে কেনো? তাঁদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান নেই, শিক্ষা স্বাস্থ্যর কথা বাদই দে। ঈশ্বর এইরকম এক চোখোমি করেন কেনো? তাহলে কি ধরে নেব সব ঈশ্বর ধনীদের গৃহেই অবস্থান করেন। সমাজে দরিদ্র অভুক্ত বস্ত্রহীন নিরাশ্রয় মানুষের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডে কোনো ঈশ্বর নেই এই মহাবিশ্বে।

১ম - দেখ এত প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না, কিন্তু ঈশ্বর ছিলেন, আছেন আর থাকবেন এই বিশ্বাস আমার চিরকাল অটূট থাকবে।

দুই বন্ধুর কথপোকথনে একটা জিনিষ উঠে আসে সেটা হল বিশ্বাস শুধু বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভাইরাস আমাদের সমাজকে হাজার হাজার বছর ধরে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। একটু অন্যরকম কথা শুনলেই এদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে এবং সমস্ত রকম অসভ্যতা নিয়ে

দাঁত নখ বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ যুক্তিবাদীদের উপর। তখন সামান্য ভদ্রতার মুখোশটুকুও থাকে না।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের বক্তব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়ে। তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা দ্বারা সৃষ্টির আগে মহাবিশ্বের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তিনি শূন্য হতে সব কিছু তৈরি করেছেন। কিন্তু এই ধরণের দাবী অযাচাই যোগ্য, ঈশ্বর যে ছিলেন তার প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত আর পারবেনও না। আমরা কেমন করে জানবো এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির আগে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল ছিলেন; অথচ মহাকাশ মহাবিশ্ব কিছুই ছিল না। এটা সত্যি যে আজকের এই মহাকাশ মহাবিশ্ব নীহারিকা তারকারাজির সর্বদা অবস্থিতি ছিল না। এগুলির সৃষ্টির কোনো উপাদান যদি মহাবিশ্বে বর্তমান না থাকতো তাহলে হঠাৎ করে ঈশ্বর কার থেকে এই গ্যালাক্সি নীহারিকা নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরি করলেন? সুতারাং হঠাৎ করে এইসব ঈশ্বর দ্বারা তৈরি হয়েছে এই যুক্তি ধোপে টেকেনা। তার চেয়ে বরং পূর্ব থেকেই পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল এটা মেনে নেওয়া সম্ভব। পরমাণুর সংযোগে সূর্যের ও অন্যান্য নক্ষত্রের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু এখনো পরমাণুর সংমিশ্রণ কেন ঘটে জানিনা। বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্ব গঠনের কারণ অনুসন্ধান করে সার্নের গবেষণাগারে বোস হিগিন কণার সন্ধান পেয়েছেন| কিন্তু এনার্জি কি করে ভরে রূপান্তরিত হয় তা এখনও জানতে পারেনি।তবে এই অনুকল্পের প্রমাণ

দেখা যায় মহাকাশে অবিরাম তারকারাজির উদ্ভবে ও মৃত্যুতে।

তাই বলা যেতে পারে সৃষ্টির সূচনা পদার্থ থেকে নয় বরং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর। এই পরিস্থিতিতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেখানো মুশকিল। আমরা যদি ধরে নিই যে, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিলনা তাহলেও সমস্যা দেখা দেবে, সেই সমস্যা হচ্ছে -

১) মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ কি?

২) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আগে থেকে কেন ছিলনা?

৩) ঈশ্বর কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন?

এইরকম বিভ্রান্তির মাঝে আমাদের পার্থিব মনে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা বুদ্ধিমান মানুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য জীবের সাথে একই শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে রজি নই। বহু পূর্ব থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে না পেরে ভয় থেকে বিশ্বাস করে আসছে এই বিশ্ব মহাবিশ্বে সবকিছু কেউ না কেউ একজন শুরু করছেন এবং তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন সকল শুভ ও অশুভ প্রভাব। এই ধারণার পক্ষে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বই লেখা হয়েছে, সঙ্গীত রচিত হয়েছে, কাল্পনিক কথাবার্তা উপন্যাস রচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আদিম বা প্রগতিশীল বর্তমান সমাজেও ধর্মের দারুণ প্রভাব বিরাজমান। আদিম সমাজে কুসংস্কার ও

মোহ ছিল চূড়ান্তরূপে। আবার আধুনিক প্রগতিশীল সমাজে চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রভাবে সভ্য এবং ন্যায় সঙ্গত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। চিন্তাবিদরা আবির্ভূত হয়েছে আইন প্রণয়নকারী দার্শনিক, বিজ্ঞানী; সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ সমাজ সংস্কারকের রূপে। যেমন হাম্বুরাবি, কনফুসিয়াস, গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, ডিরোজিও শত শত মানুষের নাম করা যায়। আর মানুষ যে সমস্ত জিনিসে ভয় পেয়ে ঈশ্বর বা ধর্মের সৃষ্টি করেছেন তার অনেকটাই ব্যাখ্যাযোগ্য। এই মহাবিশ্বে সব ঘটনার একটা কার্য কারণ সম্পর্ক আছে, মানুষের পক্ষে হয়তো সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, এটাইতো হবে আগামীতে, মানুষ চাইবেই প্রকৃতির এই জ্ঞান আহরণ করতে, তবেইতো সে অন্য জীবেদের থেকে পৃথক।

ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া শুনেছি গাছের পাতাও নড়েনা। সত্যিই যদি ঈশ্বর শক্তিমান সর্বজ্ঞ হোন, সমস্ত সৃষ্টির কর্তা হোন এবং চান যে তাঁর প্রতি সবাই বিশ্বাস আনুক বা সেমেটিকদের মতো ঈশ্বর প্রেরিত মেসেঞ্জার বা রসুল/নবীদের প্রতি সবাই বিশ্বাস আনুক এবং তার শিক্ষা গ্রহণ করুক তবে ঈশ্বরের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে সবাইকে ভাল এবং বিশ্বাসী বানিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠানো। অন্যধারে উনিই যদি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান তাহলে উনিই ভাল খারাপ মানুষ করে পাঠিয়েছেন এই পৃথবীতে; তাহলে সবজান্তা ঈশ্বরের মানুষকে পরীক্ষার জন্য বলাটা একটু হাস্যকর হচ্ছেনা কি? বা ঈশ্বর নিজে ঐ

মেসেঞ্জারদেরকে মানুষের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে পারতেন তাহলে নবিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য এতগুলি যুদ্ধ আর লোকক্ষয় করতে হতোনা; ক্রুসেডে এত লোক নিহত হতো না। দুর্যোধনকে ভাল সৎ করে তুললে শ্রীকৃষ্ণের ভোজবাজি বিশ্বরূপ অর্জুনকে দর্শন করাতে হতোনা; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এতো লোকক্ষয় হত না বা কংসকে সৎ ভাল মনের করলে দেবকী বাসুদেব এত কষ্ট পেতেন না, মৃত সত্যবানকে সাবিত্রীর বাঁচিয়ে তুলতে হত না। এই কঠিন প্রক্রিয়ায় একজন মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করা বা কুমারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া বা নদীকে দুভাগ করা বা চাঁদকে দ্বি-খণ্ডিত করা বা মেরাজে করে সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করানোর ক্ষমতার চাইতে অনেক সহজতর। তখন দেব দেবী বা ভগবানের দূত মুসা ঈশা আল্লাহর এই উদ্ভট অবৈজ্ঞানিক কাজ করার প্রয়োজনই পড়ত না। সারা পৃথিবীর সবাই ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে যেত। তাহলে??

অন্য গ্রহের আগন্তক বনাম ইমাম মাহাদী

লি খে ছে ন – সা হা দা ত হো সে ন



খোরাশান ফারসি শব্দ, যাহা 'খোর' ও 'আসান' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। 'খোর' অর্থ সূর্য এবং 'আসান' অর্থ উদয়াচল। অর্থাৎ 'খোরাসান' মানে সুর্যের উদয়াচল। খোরাসান নামের এই বিশাল ভূখণ্ড ওই অঞ্চলের পূর্বদিকে অবস্থিত হওয়ার কারণে তাকে 'খোরাসান' বলা হয়। মাদ্রাসা পড়ুয়ারা 'খোরাসান' শব্দের সাথে বেশ পরিচিত। হাদিসের গ্রন্থাদি থেকে নিয়ে প্রায় সব আরবি কিতাবাদীতে 'খোরাসান' শব্দটি পাওয়া যায়। কারণ, এসব কিতাবের লেখক বা কিতাবে উল্লেখিত মুসলিম পণ্ডিতদের প্রায় অনেকেরই জন্মস্থান এই খোরাসান।

প্রাচীণকালে 'খোরাসান' বলতে এক বিশাল ভূখণ্ড বুঝানো হত। বর্তমান পৃথিবীর পাঁচটি দেশ নিয়ে ছিল প্রাচীন 'খোরাসান'র ভৌগলিক সীমারেখা। এই পাঁচটি দেশ হলো- পূর্ব ইরান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান। তবে এখনও ইরানের একটি প্রদেশ 'খোরাসান' নামে পরিচিত। এসব দেশ বর্তমানে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। আজও এসব অঞ্চলে ইসলামি নিদর্শনাবলী অতীত কীর্তি ও ঐতিহ্যের কালসাক্ষী হয়ে আছে। নব্বই দশকেই আগে এই দেশগুলো কম্যুনিস্ট বিপ্লব গ্রাস করে নিয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই খোরাশান থেকেই নাকি ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে ঘোড়ায় চড়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে বিমান, মিজাইল, এটমবোম, সাবমেরিনসহ অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলা করে সমগ্র পৃথিবী করায়ত্ব করবে? বিষয়টি শুনতে হাস্যকর মনে হয়। তবে এটি হাস্যকর নয় আফগানিস্তানের খোরাশান নামক অঞ্চলের লোকদের নিকট কারণ বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগেও যাদের একমাত্র যানবাহন হলো ঘোড়া।

কোন গ্রহে প্রাণ সৃষ্টি নির্ভর করে সেখানকার তারা বা নক্ষত্র থেকে নিঃসৃত আলোর পরিমানের উপর। সূর্যের চারিদিকে প্রান সৃষ্টির সহায়ক সিস্টেমকে ইকোসিস্টেম বলে। আমাদের সৌরজগতে ইকো সিস্টেমের অন্তর্গত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহ।

অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব:

আমাদের সূর্যের ন্যায় আনুমানিক ২০ হাজার কোটি তারা নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের Glaxy, যার নাম ছায়াপথ বা Milky Way। অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই পর্যন্ত 2 লক্ষ কোটি Galaxy এর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।



সৌরজগতের ন্যায় প্রতিটি তারার নিজস্ব ইকোসিস্টেম রয়েছে। কেবলমাত্র ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হলেই কোন গ্রহে প্রাণ সৃষ্টি হবে না। এক্ষেত্রে গ্রহের আকার, তার মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণও গ্রহের সমস্ত পদার্থকে ধরে রাখতে তথা প্রান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত দুটি বিষয়কে বিবেচনা করে কিছু বিজ্ঞানী অনুমান করেছেন, অন্ততপক্ষে ১০০টি তারার গ্রহের মধ্যে একটি গ্রহেও যদি প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে তাহলেও এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যালাক্সি সমূহে পৃথিবীর ন্যায় হাজার হাজার কোটি গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। মানুষ প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই

সমস্ত গ্রহের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। ভবিষ্যতে টেকনোলজি আরো অনেক উন্নত হবে এবং তখন যোগাযোগ সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত: পানিতে যেমন জলজ প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে, স্থলে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী তদ্রূপ কিছু বিজ্ঞানীর মতে গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ও গ্যাসীয় প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। যাহা আমাদের নিকট দৃশ্যমান নয়।

যে সমস্ত গ্রহে প্রাণের সঞ্চার আমাদের চেয়ে অনেক পূর্বে সংঘটিত হয়েছে তারা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে রয়েছে এবং যাদের আমাদের চেয়ে পরে হয়েছে তারা আমাদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি দিয়ে পৃথিবীর অতি নিকটের গ্রহ মঙ্গল গ্রহেই মানুষ যেতে পারেনি। এর চেয়েও উন্নত মানের প্রস্তাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারকা আলফা সেন্টুরিতে যেতে এবং ফিরে আসতে কমপক্ষে 3000 বছর সময় লেগে যাবে।

একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

এক গ্রামের এক বাটপার ও সন্ত্রাসী গ্রামবাসীদের মিথ্যা মামলা, নারী নির্যাতন, সম্পত্তি দখল, চাঁদাবাজি সহ নানা ভাবে নির্যাতন করত। কিন্তু মৃত্যুর সময় গ্রামবাসীদের ডেকে সকলের কাছে মাফ চাইল এবং বলল, আমার মত পাপী লোক তোদেরকে বহু হয়রানি, নির্যাতন, জুলুম করেছে। এই পাপি মরলেও শান্তি পাবে না রে। আমার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি যাতে এই গ্রামে সৃষ্টি না হয়, সেই

জন্য মৃত্যুর পর আমার পাছা দিয়ে বাঁশ ঢুকাইয়া তিন রাস্তার মোড়ে ঝূলাইয়া রাখবি।

যেমন কথা তেমন কাজ। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর গেল গ্রামবাসীরা একটি লোককে মেরে তিন রাস্তার মোড়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। তাই সারা গ্রামে পুলিশি অভিযান শুরু হল এবং লোকজন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। গ্রামবাসী বলতে লাগল-

হায় রে বাটপার পাজি, বেঁচে থাকতে জ্বালাইয়াছিলি কিন্তু মরে গিয়েও শান্তি দিলি না।

ইমাম মাহাদীর পরিচয়

অতীতে কয়েকবারই ইমাম মাহাদির আগমনের সময় অতিক্রম হয়েছে এবং গত ১০০ বছরেও কয়েকবার ইমাম মাহাদীর পৃথিবীতে আসার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া অতীত থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদেরকে ইমাম মাহাদী বলে দাবি করেছিলেন। এখনও আফগানিস্তান, সৌদি আরব ও পাকিস্তানে ইমাম মাহাদীকে নাকি দেখা যাচ্ছে। তারপরও হুজুররা ইমাম মাহাদী আসবে বলে মানুষকে প্রতারিত করছে।

মূলত ইমাম মাহাদী, হযরত ঈসা, শ্রীকৃষ্ণরা হলেন সন্ত্রাসীদের গডফাদার। তাদের মুলা দেখিয়ে কুচক্রী মহল গোপনে সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং ইমাম মাহাদীর সৈনিক বানানোর জন্য মানুষকে জিহাদী তৎপরতায় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে।

এইভাবে সরল মানুষকে ভয় দেখিয়ে ধর্মের আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ ধর্ম না থাকলে যে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা বলে থাকে, ধর্মের মৃত্যু হলে অর্থাৎ মানুষ ধর্ম বিমুখ হলেই পৃথিবীতে মুসলিমদের মতে ইমাম মাহাদী, খ্রিস্টানদের মধ্যে হযরত ঈসা হিন্দুদের মতে শ্রীকৃষ্ণ এবং ইহুদিদের মতে দাজ্জালের আগমন ঘটবে।

ইমাম মাহাদী যুদ্ধ করে পৃথিবীর ১/৩ অংশকে হত্যা করবে, ১/৩ অংশ পঙ্গু করবে এবং তারপর একশত বছরের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হবে। এত বড় বিপর্যয়ের পর এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার পর কেয়ামতের বা পৃথিবী ধ্বংসের কোন যুক্তি কথা থাকতে পারে না। এটি কুচক্রী মহলের এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করার একটি নীল নকশারই অংশ মাত্র।

বাস্তবে মৃত্যুর পর কেউ কখনোই সশরীরে ফিরে আসতে পারে না কিন্তু এই ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মান্ধদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে যদি কখনো পৃথিবী অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন এই সমস্ত ধর্মান্ধ ধার্মিকেরা অজ্ঞতাবশত তাদেরকে ইমাম মাহাদি, ঈসা, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ ইত্যাদি মনে করে তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে এবং নিজেরা নিজেদের সুন্দর পৃথিবীর ক্ষতি সাধন করবে।

আমাদের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর অন্য গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে আমাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অনেক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করতে সক্ষম। ভবিষ্যতের এই

অনাকাঙ্ক্ষিত তৎপরতার মোকাবেলা ও পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর হতে হবে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস নিশ্চই কোন কিছ উপলব্ধি করে এইরুপ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করেছেন - "আমি মনে করি, একটি বিপর্যয় হবে। সম্ভবত বহিরাগতরা হবে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। এই গ্রহেই একই প্রজাতির হলেও অগ্রসর গোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর সাক্ষাতের ইতিহাসটা খুব একটা সুখকর হয়নি। আমি মনে করি, সতর্ক হওয়া উচিত আমাদের"

"যতদিন পর্যন্ত গরীবের শ্রমে বড় হওয়া লোক থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ ভাই-ভাই হতে পারবে না।"

- রাহুল সাংকৃত্যায়ন (ভোলগা থেকে গঙ্গা)

পিতৃতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ

লি খে ছে ন – ঈ শা চ ক্র ব র্তী



প্রাচীন ইতিহাস বা মধ্যযুগিয় বা আধুনিক যুগ, প্রতি যুগেই সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পিতৃতন্ত্রের হাত ধরেই বিদ্যমান হয়েছে। এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা গুলিই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়। কিছু "অহিংস" রাজা বাদে প্রাচীন ভারতের যেকোনো রাজাই অন্য প্রদেশ আক্রমণ করেছে, লুট করেছে, জয় করেছে এবং নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে।

সামন্ততন্ত্র হলো একটি পিতৃতান্ত্রিক মানসিকিতা তাই বিজয় ও বিস্তার ই একমাত্র ধর্ম। কেনো সামন্ত তন্ত্র পিতৃতান্ত্রিক? প্রাচীনকালে মানবসভ্যতা ছিলো মাতৃতান্ত্রিক। নারী যেহেতু অন্য প্রাণের জন্ম দিতে পারতো, তাই সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে থাকতো মহিলারা। এই সময়

সমাজ সঙ্গবদ্ধ পরিবারের রূপে বসবাস করতো। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে খাদ্য সংগ্রহ সবই লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে মিলে করতো। লিঙ্গ নির্ধারিত কাজের বা জেন্ডার রোলস এর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। কিন্তু পুরুষ ক্রমে জন্মদানে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হলো। পরিবারে বিভক্ত হতে শুরু করলো সমাজ। পরিবারের সংগ্রহিত সম্পদ পরিবারেই যাতে থাকে, তার জন্য পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত ধনের প্রথা শুরু হলো। সংগ্রহিত সামগ্রী আর কলেক্টিভ সমাজে বিতরণ হতো না। পরিবারে নারীর ক্ষমতা কমিয়ে লিঙ্গ নির্ধারিত কাজের ব্যবস্থার জন্ম দিলো। যেহেতু মাতার মেয়ে অন্য পরিবারের অংশ হবে ভবিষ্যতে তাই পুঁজি সংরক্ষণ পিতা-পুত্র সূত্রে প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চারিত হলো। তৈরী হলো পিতৃতন্ত্রের। মানুষের লোভ জন্ম দিলো এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার , যা সাম্রাজ্যবাদের মতো ঘৃণ্য ও ধ্বংসাত্মক মানসিকতার মূল কারিগর।

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ও একই মনোভাবাপন্ন। কারণ এর মূল ভিত্তি সেই কম্পিটিশন। নিও লিবারেল পুঁজিবাদে নারীর উত্থান বিভিন্ন পদে সম্ভব হলেও পুঁজিবাদী ধনকুবের তারাই হতে পারে যাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুঁজি আছে কাজে লাগানোর জন্য। সেই পুঁজি দিয়ে উৎপাদনের সামগ্রী ও শ্রম কেনা সম্ভব হয়। যা জন্ম দেয় আরও পুঁজির। এর ফলে উত্তরোত্তর পুঁজির বৃদ্ধির ফলে ধনকুবের পুঁজিবাদীদের উত্থান হয়। যারা শ্রমিক সম্প্রদায়কে শোষণ করে পুঁজির বৃদ্ধি ঘটায়। “পুঁজিবাদের

চরম স্তর হলো সাম্রাজ্যবাদ!” কারণ এই ব্যবস্থা যখন একটি দেশ অপর অনগ্রসর দেশের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজের পুঁজি বৃদ্ধির মাধ্যমে গড়ে তোলে। তখনই পুঁজিবাদ হয় সাম্রাজ্যবাদী।

ইতিহাসে হিন্দু মুসলিম বা তামিল এগুলো বড়ো কথা নয়, প্রত্যেকেই বিজয় ও বিস্তার করেছে অপরকে শেষ করে। সুলতানী আমলের পূর্বে হিন্দু রাজা বৌদ্ধদের উপরে বা অপর হিন্দু রাজার উপরে আক্রমণ করেছে বিস্তারের উদ্দেশ্যে। তখন কোনো ভারতবর্ষ ছিলো না, বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল। মৎসন্যায় পড়লেই রাজাদের বিজয় ও বিস্তারের ক্ষুধা জানা যায়। মোগল বা তার আগে সুলতান রাও একই কাজ করেছে। হিন্দুরা বৌদ্ধ স্থাপত্য ভেঙেছে, মুসলিম রাজারা হিন্দু স্থাপত্য ধ্বংশ করেছে। আবার পরবর্তীকালে হিন্দুরা বহু ইসলাম স্থাপত্য ধ্বংস করেছে বদলার নামে।

কাজেই এই পিতৃতান্ত্রিক দুই ব্যবস্থা যথা সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ চিরকাল একটি হিংসার কালচক্রের মানে cycle of hatred এর জন্ম দিয়েছে, যার নাম সাম্রাজ্যবাদ।

Bibliography: ~

1. "Origin of family..." by Friedrich Engels.

2. "Imperialism: the highest stage of capitalism" by V.I. Lenin.

নাস্তিক এবং আস্তিক

লিখেছেন – জসিমুদ্দিন আহমেদ



পর্ব - ১

"ব্রহ্ম সত্য অগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ইদমেব তু সাত্রমিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ।।"

২১ (ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী মালা)

এই শ্লোকের সরল অর্থ- "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব স্বরূপ, ব্রহ্ম হতে জীব ও জগতের পৃথক কোন সত্তা নাই। #“ঈশ্বর আছে বলা যেমন বিশ্বাস, নেই বলাও তেমনি একটি বিশ্বাস।” বা “নাস্তিকদের ‘বিশ্বাসের’ ভিত্তিতে একটি বিশ্বাস বা আরেকটি ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা। এগুলো ভুল ধারনা, কিছু নাস্তিকও নাস্তিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত পড়ালেখার অভাবের কারণে এই ভুলটি বলে থাকেন। ভারতবর্ষে উদ্ভূত দর্শনসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় আস্তিক ও নাস্তিক। যে দর্শন বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে তা আস্তিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন এবং এগুলিকেই একত্রে বলা হয় ষড়দর্শন। আর চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদে বিশ্বাসী নয় বলে এগুলি নাস্তিক দর্শন হিসেবে পরিচিত। উলে¬খ্য যে, আস্তিক-নাস্তিকের ক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনো কারণ নয়, যেমন ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথচ উভয়ই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। বৈশেষিক দর্শনেও সরাসরি ঈশ্বরের কথা নেই। সাংখ্য ও যোগ জগতের স্রষ্টা হিসেবে পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করলেও যোগ ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাসী। ন্যায় আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও জগতের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করে এবং বেদান্ত ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) তথা ব্রহ্মে (নির্গুণ) বিশ্বাসী; বেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা। ফলে দেখা যায় যে, একই

উৎস থেকে জন্ম হলেও আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে অমিল রয়েছে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করে।

চার্বাক দর্শন না নাস্তিক দর্শন জড়বাদী। চার্বাক বা নাস্তিক দর্শন যে অতি প্রাচীন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ও সাহিত্যে,মহাভারতে এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। জড়বাদী দর্শন ঘোরতর বেদ-বিরোধী এবং বেদ নিন্দুক তাই মনুস্মৃতি তে মনু মহারাজ বলেছেন "নাস্তিকো বেদনিন্দুকঃ"-অর্থাৎ যে বেদ নিন্দা করে (অপমান, ত্যাগ অথবা বিরূদ্ধাচরণ)। কেউ যদি চেতন-সত্ত্বা কে অস্বীকার করে জড়বাদী হয়, তা তার বুদ্ধি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

চার্বাক মতে, পাপ নেই,পুণ্য নেই। পাপ-পুন্যের কর্মফল ভোগও নেই। অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই। ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখই একমাত্র সুখ। দেহের মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। ইন্দ্রিয়লিপ্সু সাধারণ মানুষের কাছে চার্বাক নিতি খুবই হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম, বর্ত্তমানে বিশেষত যারা ইসলাম ত্যাগ করে দিশেহারা (দিগ্ভ্রান্ত)। সহজ কথায় বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মনগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ.. ভারতীয় দর্শনের মূল চিন্তাভাবনা থেকে চার্বাক, নাস্তিকতা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। এই দর্শনের কথা হল-কামের (ইন্দ্রিয়-সুখ) চরিতার্থই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ যা অন্যান্য দর্শন ও বৈদিক শাস্ত্রে ত্রিবিধ দোষ থেকে মুক্তির উপায় বা মোক্ষ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এই দর্শন বলে-যতদিন বাঁচবে ভোগ-সুখে বেঁচে থাক, প্রয়োজন হলে ঋণ করেও

ঘি খাও। জীবনে খাও-দাও ফূর্ত্তি কর, কেননা আগামীকালই তোমার মৃত্যু হতে পারে। ভবিষ্যতের না-পাওয়া সুখের মিথ্যা ছলনায় বর্ত্তমানকে ত্যাগ করো না। বাকী কিছু বৈদিক মান্যতা গ্রহণ করে তাঁরা এটা মানে সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক কিন্তু সুখের পরিভাষা তাঁদের আলাদা।

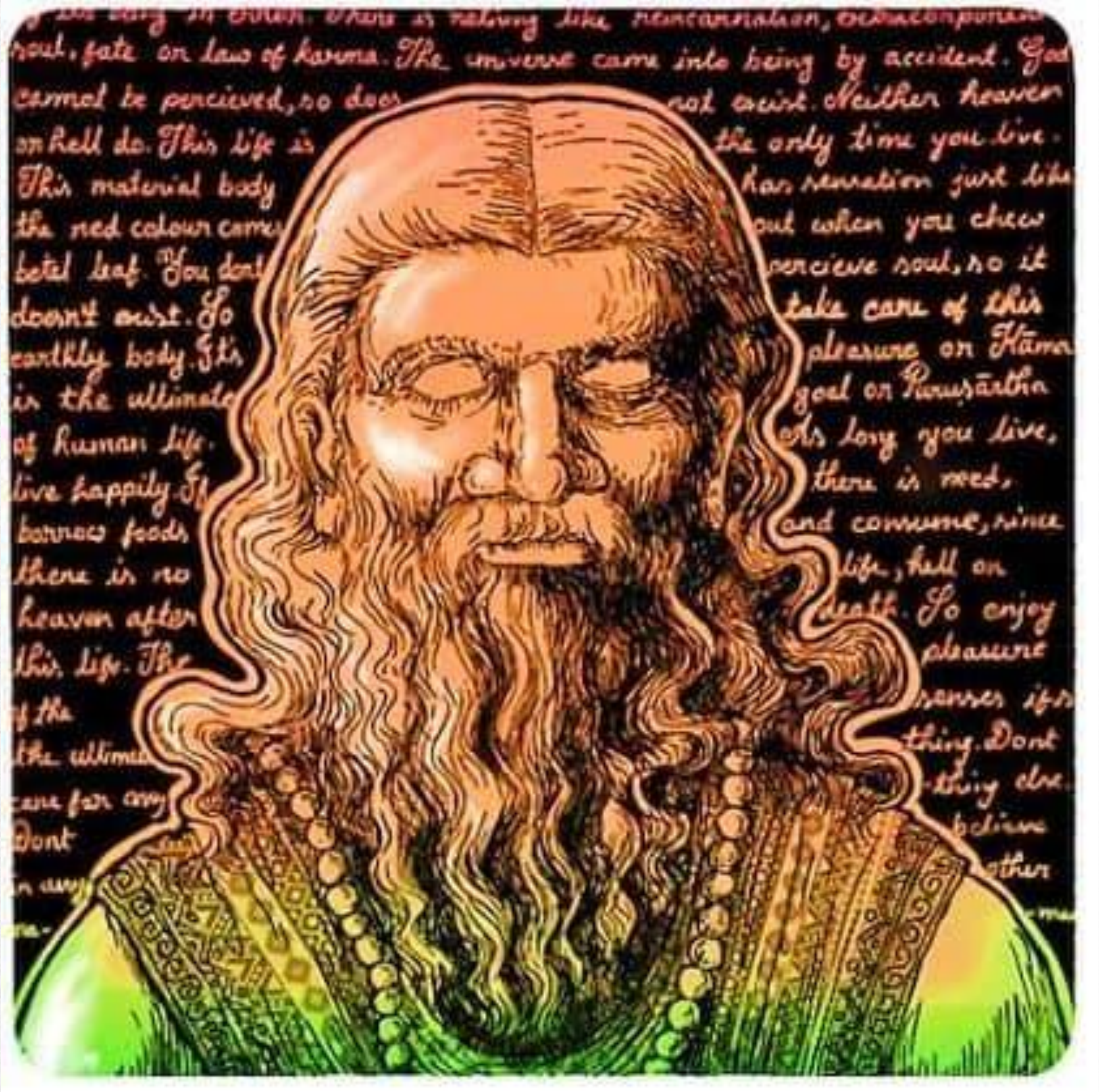
এই মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই, দেহের সুখই আত্মার সুখ। কোন কারণেই নিজেকে ইহলৌকিক সুখ থেকে বঞ্চিত করো না। সাধারণ লোকের কাছে এই ধরনের কতা শ্রুতিমধুর বা চারুবাক্ বলে এই দর্শনের নাম "চার্বাক" হয়েছে। তবে অনেক পন্ডিতের মতভেদ আছে "চার্বাক" নামের উৎপত্তি বিষয়ে।

যেমনঃ "চর্ব"-ধাতুর অর্থ হল "খাওয়া দাওয়া করা বা চর্বণ করা"। এই দর্শনের খাওয়া দাওয়াকে, ইন্দ্রিয়-সুখকে, জীবনের পরমপুরুষার্থ বা কাম্যবস্তুরূপে মনে করে বলে এর নামকরণ "চার্বাক" হয়েছে। চার্বাকের একটি নীতিবাক্য হল "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। আবার অনেকের মতে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা দেবগুরু বৃহস্পতি। চারু শব্দের একটা অর্থও বৃহস্পতি। তাহলে "চারুর্ বাক্" অর্থাৎ "বৃহস্পতির কথা"। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে এই দর্শন অনুসরণ করে অসুরকুল যাতে সমূলে ধ্বংস হয় তার আয়োজন। এই দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে যথাঃ বৈতন্ডিক, ধূর্ত, সুশিক্ষিত।

এই জ্ঞানতত্ত্বের সার কথা হলঃ (ক) প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ [প্রত্যক্ষমেকৈব্-Perception is the only source of Knowledge], চার্বাকের এই মত মানলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন জীবে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান না করলে চলে না। লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য তাই প্রত্যক্ষ-অতিরিক্ত অনুমানকেও স্বীকার করতে হয়। (খ) অনুমান প্রমাণ নয়, (গ) আগম বা শব্দ প্রমাণ নয়, (ঘ) বেদবাক্য, শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য নয় কোন বিজ্ঞানীর শ্রুতি বাক্য বা অনুমান তাঁর মান্যতাদেয়। প্রত্যক্ষের অর্থ প্রথমত অনুভব {ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ(যোগ) জনিত অনুভব}, দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভব [টেবিল দেখে টেবিলের যে জ্ঞান তা অন্য কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না],তৃতীয় প্রত্যক্ষ সম্যক অনুভব [সম্যক অর্থে সংশয়শূন্য ও বিপর্যয়শূন্য। অনিশ্চিত জ্ঞান হচ্ছে সংশয়। যেমন- ঐ বস্তুটি মূর্ত্তি, না মানুষ ? মিথ্যা জ্ঞানকে বলে "বিপর্যয়"-আকাশে দুটি চাঁদের জ্ঞান]। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ- বাহ্যপ্রত্যক্ষ [চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক-এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের যে সাক্ষাৎ] ও মানসপ্রত্যক্ষ [মনের সাহায্যে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ]।

ন্যায় দর্শন বা বৈশেষিক দর্শনের সমস্ত প্রামাণ কে চার্বাক দর্শন গ্রহন করে না, বৈদিক দর্শন শাস্ত্রে "প্রত্যক্ষ" শব্দটি-কে যেমন যথার্ত জ্ঞান লাভের উপায় অর্থে ব্যবহার করা

হয় তেমনি আবার 'যথার্থজ্ঞান' অর্থেরও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ "প্রত্যক্ষ" শব্দটি একই সঙ্গে "প্রমাণ" এবং "প্রমা" অর্থে ব্যবহার করা হয়।



চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষ আবার সবিকল্প অথবা নির্বিকল্প হতে পারে[যেমন- আমি "একটা কিছু" দেখেছি, কিন্তু সেটা কি বস্তু, সে জ্ঞান একনও হয়নি]। যাই হোক অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। চার্বাক মতে পরোক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট ও অযথার্থ, এই যুক্তি তে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও অযথার্থ বলতে হয়, কেননা প্রত্যক্ষজ্ঞানও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-নির্ভর, তাই তা পরোক্ষ তা অযথার্থই।

আবার দেখুন নাস্তিক চার্বাক মতে "সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ"-সকল ক্ষেত্রেই বলতে বর্তমান,অতীত ও ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বোঝায়, যা প্রৎয়ক্ষের দ্বারা যাচাই করা যায় না। তাহলে মানতে হয় যে, চার্বাকরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। চার্বাক মতে, 'অনুমান ও শব্দ" প্রমাণ নয়, যেখানে ঋষি বাক্যও বৈদিক সংস্কৃতিতে শব্দ প্রমাণ মানা হয়। চার্বাক মতে অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ অনেক সময় ভ্রান্ত জ্ঞান দেয়। একই যুক্তিতে প্রত্যক্ষেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, কেননা প্রত্যক্ষজ্ঞানও অনেক সময় ভ্রান্ত হয়। রুজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে (মুক্তো) রজত (রৌপ)-ভ্রম হয়।

চার্বাক মতে অনুমান প্রমাণ নয়, কেননা অনুমানের দ্বারা "প্রমা" অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানলাভ হয় না। ধূম দেখে বহ্নির যে জ্ঞান তা অনুমানলব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের মতে কখনই নিঃসন্দগ্ধ হতে পারে না। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের ওপর নির্বর করে। ব্যপ্তি হল হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত সহচর-সম্বন্ধ। দূরের পাহাড়ে ধূম দেখে যখন "সেখানে আগুন আছে" বহা হয়, তখন তা হল অনুমান। এখানে অনুমান প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

ঐ প্রর্বতটি ধূমযুক্ত

যে যে বস্তু ধূমযুক্ত সেই সেই বস্তু বহ্নিযুক্ত

পর্বতটি বহ্নিযুক্ত।

প্রতিটি অনুমানের ক্ষেত্রে তিনটি পদার্থ থাকে-পক্ষ, হেতু ও সাধ্য (যা অনুমিত হয় তা সাধ্য)। এখানে 'বহ্নি" হচ্ছে

সাধ্য, কেননা বহ্নি অনুমিত হয়েছে। যার সম্বন্ধে অনুমিত হয় তা পক্ষ। এখানে "পর্বত" সম্বন্ধে অনুমিত হয়েছে। তাই পর্বত হচ্ছে "পক্ষ"। যার সাহায্যে বা য়ার ওপর নির্বর করে অনুমিত হয় তা হেতু। এখানে ধূম হচ্ছে "হেতু", কেননা ধূম-প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে পর্বতে বহ্নি অনুমিত হয়েছে।হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহচর-সম্বন্ধ হল ব্যপ্তি। হেতু ও সাধ্যের 'নিয়ত সম্বন্ধ" বলতে বোঝায়- যেখানে হেতু সেকানে সাধ্য এবং এমন কোন ক্ষেত্রে নেই যে, হেতু আছে কিন্তু সাধ্য নেই। উল্লিখিত উদাহরণে ধূম (হেতু) ও বহ্নি (সাধ্য) মধ্যে নিয়ত সাহচর্য বা ব্যপ্তি-সম্বন্ধ আছে। যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি আছে এবং এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেকানে ধূম আছে কিন্তু বহ্নি (আগুন) নেই।

নাস্তিক দর্শনগুলি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; সেগুলি অনাত্মবাদী ও জড়বাদী। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় এবং যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষযোগ্য নন, সেহেতু তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধদর্শনের আলোচ্য বিষয় মানবজীবন; মানুষের দুঃখমোচনই এ দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। বৌদ্ধমতে জগতের সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য; যেহেতু কোনো কিছুই শাশ্বত নয়, সেহেতু নিত্য আত্মা বলতেও কিছু থাকতে পারে না। জৈনরা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। এ দর্শনে দ্রব্যসমূহকে ‘অস্তিকায়’ ও ‘নাস্তিকায়’ নামে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যার বিস্তৃতি ও কায়

(দেহ) আছে তা অস্তিকায়, যথা জীব ও অজীব (জড়) এবং যার বিস্তৃতি ও কায় নেই তা নাস্তিকায়, যথা কাল (time)। বঙ্গদেশে উপরিউক্ত দর্শনসমূহের প্রত্যেকটিরই কম-বেশি চর্চা হয়েছে এবং এখনও গুরুপরম্পরা ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হচ্ছে; তবে ন্যায়, বিশেষত নব্যন্যায়ের চর্চার জন্য এক সময় এদেশ সমগ্র ভারতে বিখ্যাত ছিল।

নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। ইংরেজি 'এইথিজম'(Atheism) শব্দের অর্থ হল নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদ। এইথিজম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক 'এথোস' (ἄθεος) শব্দটি থেকে। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি অন্ধবিশ্বাস কে যুক্তি দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে। দিনদিন মুক্ত চিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না। জাপানের ৬৪% থেকে ৬৫% নাস্তিক অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী। রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ৪৮% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ৬% (ইতালী) থেকে শুরু করে ৮৫% (সুইডেন) পর্যন্ত। পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণ ভাবে ধর্মহীন বা পরলৌকিক বিষয়

সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের মত যেসব ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় না, সেসব ধর্মালম্বীদেরকেও নাস্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা কোন বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা সকলে বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে কেউ, যে কোন মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে,নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই, আর তা হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করা।

ইংরেজিতে Believe, Trust, Faith এই তিনটি শব্দের অর্থ আগে জেনে নেয়া যাক।

Believe (অনুমান, বিশ্বাস, বিশেষভাবে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়া)

1. accept that (something) is true, especially without proof.

2. hold (something) as an opinion; think.

যেমন, ভুতে বিশ্বাস করা। এলিয়েনে বিশ্বাস করা। অথবা, বিশ্বাস করা যে, অতীতে আমাদের পুর্বপুরুষ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল। যার সপক্ষে এই বিশ্বাসী মানুষটি কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলেও তা তিনি বিশ্বাস করেন।

Trust (আস্থা)

1. firm belief in the reliability, truth, or ability of someone or something.

কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণার আলোকে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা। যেমন আমি আমার অমুক বন্ধু সম্পর্কে আস্থাশীল যে, সে টাকা ধার নিলে আমাকে ফেরত দেবে। বা ধরুন, অমুক পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ছাপে বলে আপনি মনে করেন। কারণ, অমুক পত্রিকাটি কয়েকবছর ধরে পড়ার কারণে পত্রিকাটির প্রতি আপনার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে, আপনার এই আস্থার পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে আপনার পুর্ব অভিজ্ঞতা।

Faith (বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই পরিপূর্ণ বিশ্বাস)

1. complete trust or confidence in someone or something.

2. strong belief in the doctrines of a religion, based on spiritual conviction rather than proof.

যেমন, ইসলাম বিশ্বাস করা। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা। আল্লাহ ভগবান ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা।

চলবে......

তেত্রিশ কোটি দেবতার সত্যতা

লিখেছেন - কৃষ্ণ সরকার



তেত্রিশ কোটি দেবতা - কথাটি কম বেশি সকলেরই শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন এত বেশি সংখ্যক দেবতা কি থাকা সম্ভব? অবশ্যই না। বেদ -উপনিষদ -পুরাণ ইত্যাদি সব মিলিয়েও তেত্রিশ কোটি দেবতা পাওয়া যায় না। তবে কি তেত্রিশ কোটি দেবতার ধারণাটি ভুল? অবশ্যই ভুল নয়।

আসলে 'কোটি' শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হল 'প্রকার' ও অপরটি হল 'কোটি(Crore)!' এবার প্রশ্ন হল দেবতা সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি,নাকি দেবতা তেত্রিশ প্রকারের? উত্তর হল দেবতা তেত্রিশ প্রকারের।অবশ্যই সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি নয়।

এবার এই তেত্রিশ কোটি দেবতা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক:

ঋক বেদের 3/9/9 ও 10/52/6 ঋকে 3339 জন দেবতার কথা বলা হয়েছে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেবতার সংখ্যা বলা হয়েছে 303 ও 3003,এদের মধ্যে প্রধান দেবতা 33 জন(বৃহদারণ্যক উপনিষদঃ 3/9/1 -2) অর্থাৎ এখানেও মোট 3339 জন দেবতার কথা বলা হয়েছে। কোথাও কিন্তু সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলা নেই। তাহলে আমরা মোট দেবতা পেলাম 3339 জন।

এবারে আসা যাক 33 প্রকার দেবতার প্রসঙ্গে। ঋক বেদের 1/139/11, 8/28/1 ঋকে দেবতার সংখ্যা বলা হয়েছে 33 এবং তৈত্তিরীয় সংহীতাঃ 1/4/10/1, শতপথ ব্রাহ্মণঃ 7/5/7/2 ঐতরেয় ব্রাহ্মণঃ 2/18 ইত্যাদি সবখানেই 33 জন দেবতার কথাই বলা হয়েছে।এখানে আরও একটা সমস্যার সৃষ্টি হল - আগে আমরা পেলাম দেবতা 3339 জন আর এখন পেলাম 33 জন, তবে কোনটা সঠিক আর কোনটাই বা ভুল?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে (3/9/1-11)। এখানে শাকল্য, যাজ্ঞবল্ক্যকে এক এক করে প্রশ্ন করেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য এক এক করে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন দেবগণ মাত্র 33 জন। বাকি সব তাদের বিভূতি (বৃহঃ উপঃ 3/9/2)।অর্থাৎ 3339 জনের

মধ্যে 33 জন দেবতা আর বাকি 3306 জন তেত্রিশ জন দেবতারই বিভূতি।

এই তেত্রিশ জন দেবতা হল - অষ্ট বসু,একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই মোট তেত্রিশ জন দেবতা।

অষ্টবসু হলেন: অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক ও নক্ষত্র সমুহ।

একাদশ রুদ্র হলেন: পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রীয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্ব, ত্বক) পাঁচটি কর্মেন্দ্রীয় (হাত, পা, মুখ, পায়ু, জনন্দ্রীয়) ও আত্মা বা মন।

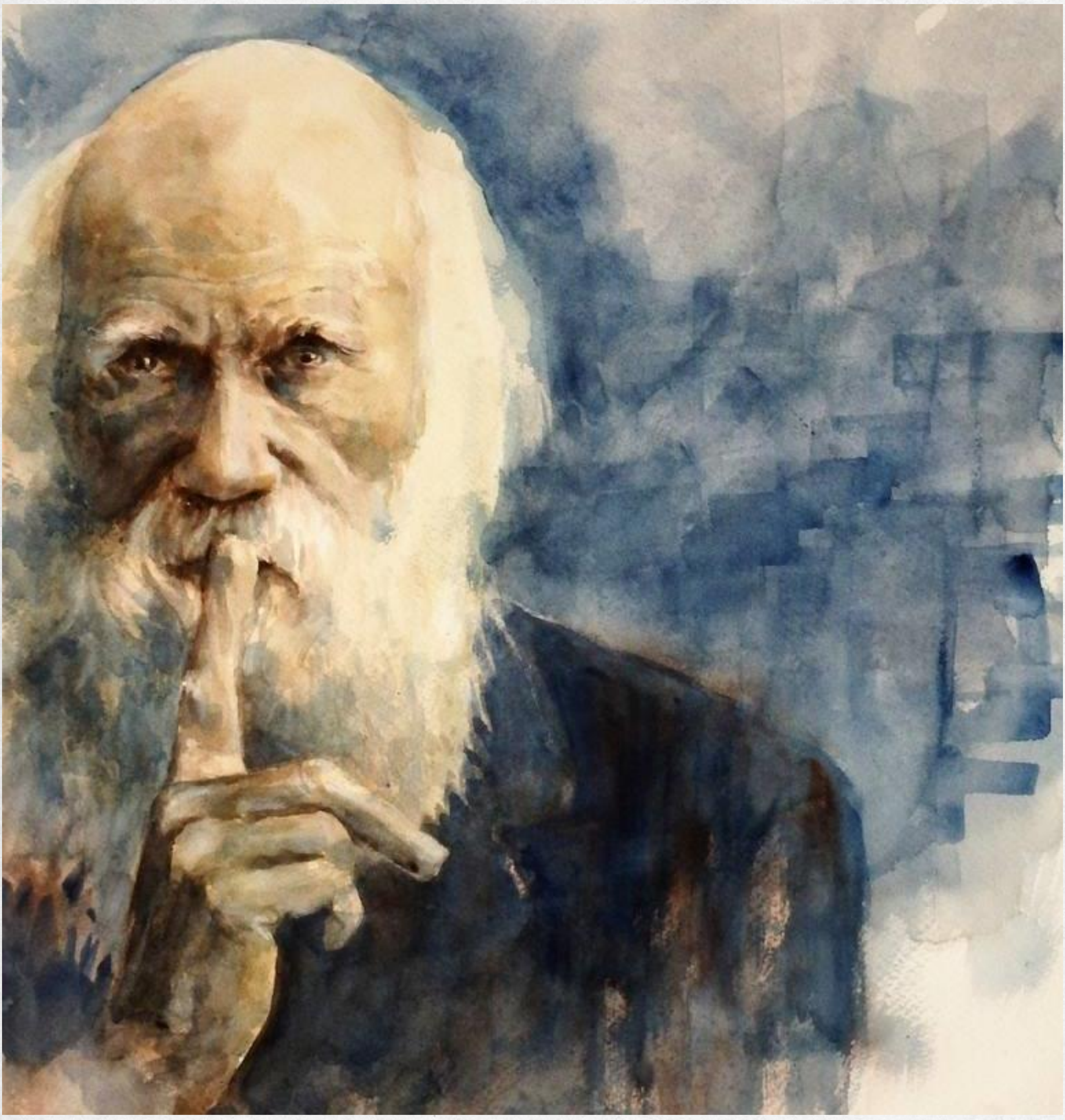
দ্বাদশ আদিত্য হলেন: বৎসরের বারটি মাস। এই সর্বমোট তেত্রিশ কোটি দেবতা অর্থাৎ তেত্রিশ প্রকারের দেবতা। পরে এদের বিভিন্ন কার্যকে আলাদা আলাদা দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। যা 3339 জন। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে দেবতা তেত্রিশ প্রকারের। বাকি সব এদের বিভূতি।

তবে পুরাণে যে এত এত দেব-দেবীর কাহিনী লেখা আছে তারা কি দেব-দেবী নন। যেমন -কালী, দূর্গা, মহাদেব ইত্যাদি ইত্যাদি। এর উত্তর জানার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে দেবতা বলতে কি বোঝায়? নিরুক্তকার যাস্ক দেবতা শব্দের অর্থ করেছেন -'যিনি দান করেন বা যিনি দীপ্ত হন বা যিনি দ্যোতিত হন বা যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিই দেবতা (নিরুক্ত: 7/11)। এই সংজ্ঞা অনুসারে বৈদিক ঋষিদের দেবতা নির্বাচন যথার্থ। কিন্তু পুরাণকার

জানিনা কেন দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ প্রকার থেকে তেত্রিশ কোটিতে নিয়ে গিয়ে তাদের ইচ্ছে মতো কাহিনী রচনা করেছেন? হয়তো বা তাদের কোনো অভিপ্রায় থাকতে পারে? তবে সেটা গবেষণার বিষয়। আমাদের শুধু একটা বিষয় জানা দরকার যে দেবতা তেত্রিশ প্রকারের এবং এরা সবাই বস্তুগত। কেউ সেই পৌরাণিক বা কাল্পনিক দেবতা নন। পুরাণের দেবতার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। পুরাণের লেখক হয়তো অজ্ঞতার বশেই তেত্রিশ কোটি কাল্পনিক দেব দেবীর সৃষ্টি করেছেন, যাদের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও আমাদের সমাজে এই কাল্পনিক ভিত্তিহীন দেব দেবীরা পূজা পেয়েই যাচ্ছে।

ক্ষমা করো ডারউইন

লি খে ছে ন – প্র বী র ব্যা না র্জি



মেঘনাদ সাহার সমালোচনা করে শ্রীঅনিলবরণ রায় (পন্ডিচেরি প্রবাসী) ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় লিখেছিলেন সাহা নাকি হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর ধর্ম নিজে না পড়িয়া অন্যের মুখে ঝাল খেয়েছেন। সাহার বক্তব্য - কোনও লোক যত

বড়ই হোক না কেন স্বীকার না করিয়া তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করা আমার কাজ নয়। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ মৌলিক।

সাহার সমালোচক মোটের উপর এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠনের এমনকি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনের সমস্ত আদর্শ বর্তমান আছে। তাঁহার বিশ্বাস যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution), পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিনবাদ (Heliocentric Theory of the solar system) ইত্যাদি বর্তমান বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলতত্ত্ব, এমনকি National Planning পর্যন্ত স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত আছে, না হয় বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু সাহা সমালোচকের এই মতকে শুধু ভ্রান্ত বলেননি, সঙ্গে এটাও বলেছেন যে এ ধারনা অজ্ঞতাপ্রসূত। সাহার মতে সমালোচক আর সকলের মতো মনে করেন “হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূল বেদ”। সমালোচক কি অবগত আছেন বিগত ১৯২৩ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জাদড়োর দুটি প্রাচীন নগরীর আবিষ্কার করে, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও মোটামুটি ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দেন। সমস্ত প্রাশ্চাত্য পন্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পন্ডিতদের মতে

(যেমন: রমাপ্রসাদ চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিরজাশঙ্কর গুহ) এই সভ্যতা প্রাকবৈদিক ও প্রাকআর্য। এই সভ্যতা তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মতো উন্নত ছিল। বর্তমান পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই প্রাক আর্যসভ্যতা থেকে গৃহীত - যেমন শিব-পশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ, ফুল-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা পদ্ধতি এবং সম্ভবত পশু, সর্প ও বৃক্ষদেবতার পূজো (সূত্র-Science and culture)।

“কাজেই হিন্দুর সমস্ত 'ব্যাদে' আছে একথা প্রস্তরীভূত(fossilized) পান্ডিত্যাভিমানী ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন।”

“বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ সূচনা করিয়াছিল সেই উভয় ধর্মেই বেদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি কি জানেন না যে লোকায়ত মতে ‘ত্রয়ঃ বেদকর্ত্তারঃ ভন্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ।’

অর্থাৎ খৃষ্টের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে একদল যুক্তিবাদী ছিলেন, যাহারা মনে করিতেন যে বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা দুরূহ; শুধু কতকগুলি ভদ্রলোক বেদের অর্থ

না জানিয়াও বেদের দোহাই দিয়া ভ্রান্ত প্রচার করে। এখনও এই শ্রেনীর লোকের অভাব নাই।"

সমালোচনা উত্তর।

মেঘনাদ সাহা-র লেখা থেকে নেওয়া।

"বৈজ্ঞানিক মেজাজ হলো চিন্তার একটা প্রক্রিয়া, কাজের একটা পদ্ধতি, সত্যের সন্ধান, জীবন যাপনের পদ্ধতি, একজন মুক্ত মানুষের উদ্দীপনা।"

- নরেন্দ্র দাভেলকার

প্রসঙ্গ: আন্দোলন

লি খে ছে ন – রা জু দ ত্ত



ধরুন আপনি দোকানে গেছেন। দোকানদারকে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটির মূল্য বাবদ কিছু টাকা দিয়ে বললেন, " আমাকে অমুক একটা দিন তো"। দোকানদার আপনার হাত থেকে টাকা নিয়ে আপনাকে আপনার প্রাপ্য জিনিসটি না দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন আপনি কী করবেন?

আপনি প্রথমে তাকে বিষয়টি জানাবেন। তারপর ক্রমশ বাকবিতণ্ডা শুরু হবে, যা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াতে পারে। শেষমেশ দোকানদার তার ভুল স্বীকার করে আপনার প্রাপ্য জিনিসটি আপনাকে দিল।

ঠিক সেইরকম, আপনি সরকারকে নিজের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাবদ, ক্রয়কৃত পণ্য বাবদ, পরিবহণ বাবদ, উপার্জন বাবদ ও আরো নানা বিবিধ উপায় কর প্রদান করছেন। তার বিনিময় আপনি আপনার প্রাপ্য দাবি করবেন না? যখন আপনি তা পাচ্ছেন না।
আপনার প্রাপ্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা যেমন অন্যায়, ঠিক তেমনই সেই অন্যায় মুখবুজে মেনে নেওয়াও অন্যায়। সে অন্যায় যেই করুক, তার প্রতিবাদ করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। অন্যায়ের সাথে আপোস করা কখনো উচিৎ নয়। এই আপোস না করার নামই আন্দোলন।

আপনি আপনার পরিবারে অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করুন, আপনি আপনার কর্মস্থলে অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করুন। আপনি প্রতিবাদ করুন আপনার সাহিত্যে, আপনার অঙ্কিত চিত্রে - স্থাপত্যে- ভাস্কর্যে, চলচ্চিত্রে। আপনি প্রতিবাদ করুন আপনার সঙ্গীত- আবৃত্তি- অভিনয় সত্বার মধ্য দিয়ে। আপনি প্রতিবাদ করুন রাজনীতির ময়দানে।

অন্যায়ের প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলন দমন করা ঘোরতর অন্যায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হোক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হোক, আমাদের উচিৎ তার তীব্র প্রতিবাদ করা। মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অন্যায়ের সাথে আপোস করে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।



ছট পুজো বাস্তবতা

লিখেছেন – সৌরাষ্ট্র দাশ

1. পুজোর পৌরাণিক বৈদিক শাস্ত্রীয় মত:

ছট পুজো এই উপমহাদেশের একটি পরিচিত একটি পুজোতে বললেই চলে। হিন্দু বর্ষপঞ্জীর কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত একটি পুজো! যা বিহারে শুরু আমরা তাই জানি সূর্য্যোপাসনার এই অনুপম লৌকিক উৎসব পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে পালিত হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এই পার্বণ প্রবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত হয়েছে। ছটে কোনও মূর্তি পূজা করা

হয় না। কিন্ত এই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের এই পুজোর কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি পাইনি...

রামায়ণে উল্লেখ থাকা মতে, রামের কুলদেবতা সূর্য্যের জন্য রাম এবং সীতা এই পূজা করেছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ থাকা মতে, দ্রৌপদী ধম্য ঋষির উপদেশ মতে সূর্য্যকে আরাধনা করে অক্ষয় পাত্র লাভ করেছিলেন। সঙ্গে মহাবীর কর্ণের কোমর পর্যন্ত জলে নেমে সূর্য্যের উপাসনা করা উল্লেখ আছে। তবে আমরা যখন মহাভারত রামায়ণ পড়ি তখন এই ছট পুজোর নিয়ম আলাদা" তার কারণ এই পুজো শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়দের ছিল। শূদ্র বৈশ্য ব্রাহ্মণদের ও নয়। তবে এই পুজো পৌরাণিক নয়। বৈদিক যেহেতু মূর্তি পুজো নেই। ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহে সূর্য্যবন্দনার স্পষ্ট নিদর্শন আছে। তবে যজ্ঞ ও আহুতি দিয়ে, কিন্ত এখানে কোনো যজ্ঞ নেই। এক কথায় ভিন্ন সব কিছুই। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মতে এই পুজোর এমন রুপ পাওয়া যায়নি।



যা বর্তমানে পুজার রুপ! তবে বেদ আরণ্যক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কোথাও এই পুজোর তথ্য নেই।

2 ||ঐতিহাসিক ও যুক্তির দিক)

এই পুজোর কোনো যুক্তি নেই আছে শুধুই জল দূষণ। এবং পরিবেশের ক্ষতি, আপনি হয় জানেন বিগত বছর ধরে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা যা হাইকোর্টেও বেশ চলছিল। জল দূষণ নিয়ে। পৌরাণিক বৈদিক তথ্য এই পুজোর সঠিক কোনো অস্তিত্ব নেই। আর থাকবেও না যখন আমরা ঐতিহাসিক তথ্য দেখব এই ছট পুজোর কোনো অস্তিত্ব নেই। বিহারের পুরাতন নাম মগধ পাটালিপুত্র যা বৌদ্ধদের ইতিহাস দখল করে আছে। আর ছট পুজোতে স্তুপ এর ব্যবহার থাকে যা পুজো হয়। আমরা যারা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জৈন বৌদ্ধ আজিকাদের নিয়ে পড়াশোনা করি। তারা সবাই জানে জৈন বৌদ্ধদের কোনো না কোনও উৎসব রীতি ইতিহাস দখল করা ব্রাহ্মণদের।

আর বলে রাখি এই পুজো ব্রিটিশ সময়কালে শুরু বললেই চলে। আমরা যখন ইতিহাসের দিকে তাকাই তখন পৃথিবীর ভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধ অশোক সময়কালে অনেক কেউ এই ভারতে পড়াশোনা করতে আসত অনেক জ্ঞান তারা নিয়ে যেত গ্রীকের মেগাস্থিনিস চীনের হিউয়েন সাঙ ও আরবের আল বুরুনির মত ব্যক্তিরা ভারত ভ্রমণ করে তারা নিজেদের বইতে ভারত নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। যার মাধ্যমে আমরা সেই সময়কার ভারতের কথা জানতে পারি। তবে মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙ, আল বুরুনি কেউ

এই ছট পুজোর কথা লেখেনি। এমন কি সংস্কৃত নামক বঙ্গদেশে মহা পন্ডিত বানভট্ট মহাশয় এই পুজো লেখেনি। না লিখেছে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব তার কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গীতগোবিন্দম্ মহা কাব্য জয়দেব কে বাদ দিলেও বিষ্ণু বর্মা, এমন কি মাধবাচার্য আদি শঙ্করাচার্য কেউই এই পুজোর ইতিহাস লেখেনি।

এই পুজো বৌদ্ধদের স্তুপ দখল করে চলছে রমরমিয়ে পুজো যা ব্রিটিশ সময় কাল থেকেই আমরা দেখি এর ইতিহাস যা। অনেকেই জানে না। জানার কথা নয়, প্রশ্ন করার মতো সবার জ্ঞান চাই যা আমাদের চোট থেকে ধার্মিক তৈরি করে প্রশ্ন করার যায়গা শেষ করা হয়। যেমন গীতা 4:40 তে বলা হয়েছেম 'যারা সংশয়বাদী হবে শাস্ত্র ও গুরুর কথার উপর তারা দুঃখ ভোগ করবে।' এর জন্য ব্রাহ্মণরা নতুন নতুন ভগবানের আমদানী করে থাকে যা তাদের জন্য সারা বছরের জীবিকা হয়ে ওঠে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের বললেও ভুল হবে। বৈশ্যদের জন্যও নানান বৈদিক পৌরাণিক পুজোর থেকে কেনা-বেচা চলে নানান সামগ্রী কিন্ত এতে আমাদের ভারত আরও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হচ্ছে। বুদ্ধ বা মহানবীর সব সময়ই শিক্ষার কথা বলছে এইসব কুসংস্কারের কথা নয়। তাদের অস্তিত্ব শেষ করতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এইসব পুজো শুরু করছে। আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আরো শক্তিশালী করছে! মুসলিমরা তারাও ভয় পেয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের ঈশ্বরহীন ধর্ম কে। সেজন্য দেখি বৌদ্ধদের অনেক কিছুই মুসলিম ও ব্রাহ্মণরা মিলে

ধ্বংস করেছে। মুসলিম শাসন কালে অনেক ব্রাহ্মণ শাস্ত্র রচনা বচন করা হয়েছে। তার তথ্য আমি আবার লিখব লাইভ আলোচনাও করবো ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে, তবে এই দখলের ইতিহাস আজকের নয়। নিজেকে প্রশ্ন করুক নিজেকে জানার চেষ্টা করুন, এটাই বুদ্ধ বলেছেন। আমাদের কুসংস্কার মুক্ত হতে হবে।

"যে বিশ্বাস নিজেকে তথ্য বা সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই হতে দেয় না তা আসলে একটা কুসংস্কার।"

- নরেন্দ্র দাভেলকার

অবিশ্বাসের ব্যবসা ভাঙতে হবে

লিখেছেন – সায়ক সরকার



আমাদের প্রয়োজনে আজকে আমরা 6G, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), Internet Of Things, অটোমেশন নিয়ে কাজ করছি। এই প্রযুক্তি ভারতের মতো দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

একটা সময় ছিলো যখন আদিম মানুষ পশু শিকার করে খেত, আজকে সেই মানুষ একটি চাপে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের তথ্য পেয়ে যাচ্ছে।

আজকে আমরা পৃথিবীর গতি সম্পর্কে এতটাই জানি যে পৃথিবীর বাইরের কক্ষপথে স্যাটেলাইট পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটা সময় আমরা এসব কিছু জানতাম না, আগুন বা বৃষ্টির ভয় আমাদের এক অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করেছিল। আজকে সেই শক্তির খোঁজ আমরা পেয়ে গেছি।

কিন্তু আজও অনেক মানুষ সেই পুরোনো ভুল বিশ্বাস আকড়ে ধরে বসে আছে, তারা এতটাই উন্মাদ যে সেই বিশ্বাস গুলোকে সমাজের বুকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে, কারণ তাতে তাদের লাভ। সমাজের বুকে তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে নেতা স্থানে বসবে। হাজার বাধা সত্বেও ডিরোজিও, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর রা শেষ অবধি লড়ে গেছিলো। কোনো ক্ষমতা তাদের দমাতে পারেনি

পুরনো ভাবনা গুলো ধর্ম, সংস্কৃতির আড়ালে বেড়ে উঠছে। সেগুলো মানতে না চাইলে বলে দেওয়া হয় যে অমুক জায়গার লোক হয়ে অমুক সংস্কৃতি কিভাবে অস্বীকার করতে পারি।

একটা সময় চিঠিতে কথা বলতাম, এখন ভিডিও কল করে একে অপরকে দেখতে পারি। পরিবর্তন সমাজের নিয়ম, একের পর এক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে ধর্মীয় বিশ্বাস আর সংস্কৃতির আড়ালে যে পুরোনো বিশ্বাস গুলো সমাজে আছে সেগুলো যাবে না কেন? ফেসবুক - টুইটারে সেই বিশ্বাসের নামে কিছু লোক সমকামিতা পাপের চোখে দেখে, ছোট পোষাক পরা কে ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের বিশ্বাস না মানায় এমন করে যেনো ভিনগ্রহের প্রাণী দেখে ফেলেছে।

বিজ্ঞানের পরিবর্তনের সাথে মানুষ নিজেকে সব দিক থেকে নিজেকে ছাপিয়ে যাবে, এটা ঠেকানোর চেষ্টা বোকামি। গ্যালিলিওর তত্ত্ব আজকে দাঁড়িয়ে প্রমাণিত

অনেকে তাদের পুরোনো ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের হদিস পায়। তাই যদি হয় সেই সময়ে দাড়িয়ে আজকের সাফল্য পাইনি কেন?

তালাক - তালাক - তালাক

লি খে ছে ন - অ ভি ষে ক দে



দিনটি ছিল ২৩ আগষ্ট ২০১৭। অঝোরে কাঁদছিলেন নুসরত, কাঁদছিলেন সায়রা বিবি, কাঁদছিলেন নার্গিস, তাবসসুম এর মতন অনেকেই। এই কান্না কোনো দুঃখের নয়, বরং আনন্দের। আজ প্রবল তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই ঐতিহাসিক একটি রায়-এ "তিন তালাক" বাতিল করে ভারতের শীর্ষ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে-

“তিন তালাক, অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং ইসলামের অংশ নয়”।

প্রধান বিচারপতি জে এস কেহর (শিখ) এর নেতৃত্বে ছিলেন পাঁচজন ভিন্নধর্মমতের বিচারপতির বেঞ্চ। যথা, এস আব্দুল নাজির (মুসলিম), কুরিয়েন জোসেফ (খ্রিস্টান), ইউ ইউ ললিত (হিন্দু) এবং রোহিন্তন ফলি নরিম্যান (পার্সি)। উক্ত পাঁচজন ব্যক্তিরা, আজ তাৎক্ষণিক বা Instant তালাক অর্থাৎ মাথাগরম করে শুধুমাত্র তিনবার তালাক উচ্চারণ করেই যে তালাক দেওয়ার কু-প্রথা সেটাই বাতিলের পথে হেঁটেছেন। যদিও আজ তালাক-এ-বিদ্দত বাতিল হলেও চালু থাকছে, তালাক-এ-এহসান এবং তালাক-এ-সুন্নত।

৩:২ অনুপাতে তিন তালাক মামলার নিষ্পত্তি হল অর্থাৎ তিনজন বিচারপতি পক্ষে এবং ২ জন বিচারপতি বিপক্ষে ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট আরো জানিয়েছে, সরকারকে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সরকার যদি এই কাজে ব্যার্থও হয় তাহলেও তিনবার তালাক উচ্চারণ করে কেউই বিবাহবিচ্ছেদ গ্রাহ্য হবে না।

তালাক শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন, ত্যাগ করা ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদকে তালাক বলা হয়। স্বামী সর্বাবস্থায় তালাক দিতে পারেন। স্ত্রী শুধুমাত্র তখনই

তালাক দিতে পারবেন, যদি বিয়ের সময় এর লিখিত অনুমতি দেওয়া হয়। পরিভাষায় তালাক এর অর্থ "বিবাহের বাঁধন তুলিয়া ও খুলিয়া দেওয়া, বা বিবাহের শক্ত বাঁধন খুলিয়া দেওয়া "স্বামী তার স্ত্রীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া।

২০০৮ সালের হিসেবে দেখা যায় বাংলাদেশে পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যেই তালাক প্রবণতা বেশি। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বর্তমানে নারী মুখবুজে সব অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেন না। প্রতিবাদ করেন। ইসলামে তালাকের পর একজন মহিলাকে ইদ্দত পালন করতে হয়। সেই (ইদ্দত কালীন) সময়ের মধ্যে একজন মুসলীম নারীর পুন:বিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন মুসলীম নারীর জন্য ইদ্দত দুই প্রকার বা ভাগে ভাগ করা সম্ভব। প্রথমত তালাকের পর, একজন মুসলীম নারীকে তার তালাকের পর ৯০ দিন বা তিন চন্দ্রমাস অপেক্ষা করতে হবে। এই ৯০ দিন হচ্ছে ইদ্দত কালীন সময়।

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে,পদ্ধতিগত দিক দিয়ে তালাক তিন প্রকারঃ- (ক) আহসান বা সর্বোত্তম তালাক, (খ) হাসান বা উত্তম তালাক এবং (গ) বিদ'ই বা শরিয়া বিরূদ্ধ তালাক। আবার, ক্ষমতা বা এখতিয়ার গত দিক দিয়ে তালাক পাঁচ প্রকারঃ- (১) তালাক-এ-সুন্নাত (২) তালাক-এ-বাদী (৩) তালাক-এ-তাফবীজ (৪) তালাক-এ-মোবারত এবং (৫)

খোলা তালাক। অন্যদিকে কার্যকর হওয়ার দিক দিয়ে তালাক প্রধানত দুই প্রকারঃ- (১) তালাক-এ-রেজী ও (২)তালাক-এ-বাইন। তালাক-এ- বাইন আবার দুই প্রকারঃ- (১)বাইনে সগির ও (২) বাইনে কবির। মর্যাদা ও অবস্থানের দিক থেকে তালাক চার প্রকারঃ- (১)হারাম (২)মাকরুহ (৩)মুস্তাহাব ও (৪)ওয়াজিব।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৮। অনেক আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কের মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর সরকার দ্বারা আজ লোকসভায় পাশ হলো তিন তালাক বিল।

তবে শুধু তাৎক্ষণিক তিন তালাক বন্ধের বিল টাই আজ পাশ হয়েছে, তিন তালাক বন্ধের নয় কিন্তু। আমাদের মনে রাখতে হবে, তাৎক্ষণিক তিন তালাক ও তিন তালাক এক নয়। তালাক-এ-বিদ্দত বন্ধের জন্য বিল পাশ করিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর সরকার কিন্তু বাকি তিন তালাক যেমন চলছে, তেমনই কি চলবে? প্রশ্নটা তুলেছেন বহু বিজ্ঞানমনষ্ক ব্যক্তিরা। তাদেরেই অনেকে জানাচ্ছেন, "আজ লোকসভায় নরেন্দ্র মোদী সরকার তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিল পাশ করানোয় অনেকেই এমন ভাবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে যেন তিন তালাক প্রথাটাই বন্ধ হয়ে ভারত থেকে চিরতরে।"

এইপ্রসঙ্গে জানাই, সংবিধানে উল্লেখিত "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" ভারতে তিন তালাক চালু রয়েছে শুধু তাই নয়, তথাকথিত

স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরেও ভারতে লাগু আছে শরীয়া আইন- "The Muslim Personal Law (Sharia) Application Act, 1937"। আইনিবিশেষজ্ঞ ওসমান মল্লিক জানাচ্ছেন, ভারতে এই শরীয়া আইন শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূলতঃ বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক, অভিভাবকত্ব এর মত বিষয় গুলি শরিয়া আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এখানে শরীয়া আইন কার্যকরী নয়। মূলতঃ এই আইন দ্বারা ভারতীয় মুসলিম মহিলারা নিষ্পেষিত ও শোষিত।

অন্যদিকে কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তিরা জানাচ্ছে- "তাৎক্ষণিক তিন তালাক ইসলামে তো এমনিতেই অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। তাছাড়া পৃথিবীর ২০টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র তাৎক্ষণিক তালাক বহুদিন পূর্বে থেকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

সাংবাদিক শুভজ্যোতি ঘোষ

বিবিসি বাংলা, দিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর একটি রিপোর্টে লিখেছেন-

"গত বছরের অগাস্টে এক ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাককে বেআইনি ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ভার তারা ছেড়ে দিয়েছিল সরকারেরই ওপর। এরপর এই

প্রথাকে শাস্তিযোগ্য করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'দ্য মুসলিম উইমেন প্রোটেকশন অব রাইটস ইন ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে একটি বিলও আনে, যা সাধারণভাবে 'তিন তালাক বিল' নামেই পরিচিতি পায়। গত বছরের ডিসেম্বরে ওই বিলটি ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাস হয়ে গেলেও রাজ্যসভায় সেটি বিরোধীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

অনেক বিরোধী দলের নেতাই যুক্তি দেন, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার জন্য বিলটিকে একটি সংসদীয় সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো উচিত। ওই বাধার মুখে বিলটি পাস করাতে না-পেরে সরকার এখন ঘুরপথে সেটিকে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইনে পরিণত করল। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতের আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এরপর বিরোধী কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন,"তাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রী একজন মহিলা (সোনিয়া গান্ধী), তা সত্ত্বেও নিছক ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য তারা পার্লামেন্টে আইন করে এই বর্বর প্রথা বন্ধ করতে রাজি হলেন না, সেটাই আশ্চর্যের ও দু:খের।" তবে পার্লামেন্টে যে বিলটি আনা হয়েছিল, তার তুলনায় এদিন আনা অর্ডিন্যান্সে শাস্তির বিধান বেশ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। মূল বিলটিতে ছিল তিন তালাক হয়েছে বলে অভিযোগ যে কেউ আনতে

পারেন, এমন কী প্রতিবেশীরাও। অর্ডিন্যান্সে অবশ্য বলা হয়েছে কেবল মাত্র তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ও তার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রাই অভিযোগ আনতে পারবেন।

এমন কী, তিন তালাক দেওয়া স্বামী যদি আপষ মীমাংসায় রাজি থাকেন, তাহলে স্ত্রী-র সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ারও সুযোগ থাকছে অর্ডিন্যান্সে।

অভিযুক্ত স্বামীর এর আগে জামিন পাওয়ারও কোনও সুযোগ ছিল না। কিন্তু অর্ডিন্যান্সটি বলছে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট চাইলে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করতে পারবেন। কংগ্রেস এর আগে সরকারকে জানিয়েছিল, তারা পার্লামেন্টে বিলটিকে সমর্থন করতে রাজি - যদি কথা দেওয়া হয় যে তিন তালাক দেওয়ার অভিযোগে কোনও স্বামীর জেল হলে সে সময় তার স্ত্রীর আর্থিক ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকারই নেবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অবশ্য সে প্রস্তাব মেনে নেয়নি। তবে বিলের সমর্থনে তারা বেশির ভাগ রাজ্য সরকারের সমর্থন পেয়েছে বলেই দাবি করছে।

আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন আরও বলেছেন, শুধুমাত্র ভারতের মুসলিম নারীদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতেই সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তার কথায়, "এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই জেন্ডার জাস্টিস (সব লিঙ্গের জন্য ন্যায়) নিশ্চিত করার জন্য, এর সঙ্গে ধর্ম বা ভোটের রাজনীতির

কোনও সম্পর্কই নেই।" খবরটির লিংক- https://www.bbc.com/bengali/news-45574788

৩০ জুলাই ২০১৯। ভারতের সংসদের উচ্চ কক্ষে তিন তালাক বিল পাশ হয়েছে। বিলটির নাম 'মুসলিম মহিলা বিল-২০১৯ [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bills, 2019]। এই বিলটির দুটি বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। যেমন- ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনও মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি তালাক উচ্চারণ করলে, তা লিখিত বা যে ভাবেই হোক, সে তালাক বাতিল বা অবৈধ হবে (Sec. 3. Any pronouncement of talaq by a Muslim husband upon his wife, by words, either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever, shall be void and illegal.)।

৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, যে কোনও মুসলিম স্বামী উপরের ৩নং ধারা অনুযায়ী তার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক উচ্চারণ করলে সেই স্বামীর তিন বৎসর জেল এবং জরিমানা হবে (Sec. 4. Any Muslim husband who pronounces talaq referred to in Sec. 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine)।

এবারে তুলে ধরছি BBC News, বাংলা'র ৩১ জুলাই ২০১৯ এর অনলাইন পত্রিকার খবর। লিংক- https://www.bbc.com/bengali/news-49174195

"তিন তালাক দিলে তিন বছরের কারাদণ্ড, ভারতে আইন পাস।"'তিন তালাক' প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করে একটি আইন অনুমোদন করেছে ভারতের পার্লামেন্ট। মুসলমানদের 'তিন তালাক' প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করে একটি আইন অনুমোদন করেছে ভারতের পার্লামেন্ট। এই আইন ভঙ্গ করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। প্রথা অনুযায়ী, তিন বার তালাক উচ্চারণ করে, বার্তা পাঠিয়ে বা ইমেইল করে মুসলিম স্বামী তাদের স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতেন।

ওই প্রথাকে অসাংবিধানিক বলে ২০১৭ সালে রায় দেয় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এই আইনের সমর্থকরা বলছেন, এর ফলে মুসলমান নারীরা আরো নিরাপদ হবেন। তবে বিরোধীদের দাবি, ফৌজদারি শাস্তির বিধানের কারণে হয়রানি এবং অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। আইনের এই প্রস্তাবটি ২০১৭ সালেই প্রথম উত্থাপন করা হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের রাজ্যসভায় সেটি আটকে যায়, কারণ কোন কোন সংসদ সদস্য প্রস্তাবটিকে অন্যায্য বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টি বিলটির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, আর প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অবস্থান

বিপক্ষে। তবে রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। মঙ্গলবার বেশ কয়েকজনের ওয়াক-আউট আর অনুপস্থিতিতে এই বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৯৯ আর বিপক্ষে ভোট পড়ে ৮৪।

এই ফলাফলকে 'লৈঙ্গিক সমতার' বিজয় বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে অনেকে অভিযোগ করছেন, এর মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি আসলে মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু করছে। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পার্টির এমপি আসাদুদ্দিন ওইসি বলেছেন, নতুন আইনটি মুসলিম সত্ত্বার ওপর বিজেপির আরেকটি আঘাত। দলটি ২০১৪ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে।

এর আগে মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তিন তালাক প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে ভারতে এই প্রথার ব্যবহার চলে আসছিল, যা বিবাহ এবং বিচ্ছেদের আইনের সঙ্গে খাপ খায় না।

২০১৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তিন তালাক প্রথাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি অর্ডিন্যান্স বা নির্বাহী আদেশ জারি করে।

তিনবার তালাক উচ্চারণ করে স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিলে এই আইন অনুযায়ী মুসলিম পুরুষদের তিন বছরের জেল ও আর্থিক জরিমানার বিধান থাকছে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর খোরপোষ পাওয়ারও অধিকার থাকবে। গত বছরের অগাস্টে এক ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাককে বেআইনি ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ভার তারা ছেড়ে দিয়েছিল সরকারেরই ওপর। এরপর এই প্রথাকে শাস্তিযোগ্য করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'দ্য মুসলিম উইমেন প্রোটেকশন অব রাইটস ইন ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে একটি বিলও আনে, যা সাধারণভাবে 'তিন তালাক বিল' নামেই পরিচিতি পায়। ডিসেম্বরে ওই বিলটি ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাস হয়ে গেলেও রাজ্যসভায় সেটি বিরোধীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। তবে এখন সেটি আইনে পরিণত হলো।"

তাৎক্ষণিক তিন তালাক এর মতন অমানবিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে বিল পাশ করানো নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিড়াট বড় সাফল্য। অনেকেই ওনাকে বিদ্যাসাগর, রামমোহনদের মতনই বড় মাপের সমাজ সংস্কারক ভাবতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আছেন নিজের মধ্যেই। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, যা ইসলামে ইতিমধ্যেই বাতিল ও নিষিদ্ধ, যা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশও নয় তাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে

সুপ্রিম কোর্টের রায়, বিল পাশ করানো এবং গেরুয়া শিবিরের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাস, সত্যিই হাস্যকর। নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু করতে উদ্যোগী নন? কেন শুধু তালাক-এ-বিদ্দত? কেন তালাক-এ-আহসান এবং তালাক-এ-সুন্নতকেও পুরোপুরি বাতিল করার বিল পাশ করানোর উদ্যোগ নেই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীর?

কলকাতা নিবাসী একজন গুণী বাঙালি লেখক জানিয়েছেন, "ভারতের সর্বশেষ ২০১১ আদমসুমারি অনুযায়ী ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার মহিলা বিবাহ বিচ্ছিন্না ছিলেন, যাদের মধ্য ১৯ লক্ষ হিন্দু মহিলা এবং মুসলিম বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলা ছিল ২৮ হাজার। এই ২৮ হাজার মুসলিম মহিলাদের কতজন তাৎক্ষণিক তিন তালাকের শিকার ছিলেন তার কোনও সরকারি তথ্য নেই। তবে ১৯ লক্ষ হিন্দু বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলাদের কেউ তিন তালাকের শিকার ছিলেন না, এ বিষয়ে দ্বিমত চলে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মুসলিম মহিলাদের কথা ভেবে তিন তালাক বিল পাশ করাতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন যা খুবই ভালো পদক্ষেপ কিন্তু শুধু মুসলিম মহিলাদের সাথে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী মহিলাদের দিকটাও যেন উনি ভাবেন।"

তাৎক্ষণিক তিন তালাক বন্ধের বিল পাশ করে তিন তালাক বন্ধের কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবে এটার জন্য বিল পাশ

করার কোন দরকার নেই। সরকার যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিল পাশ করতেন তাহলে আর কোন বিলের এ ব্যাপারে প্রয়োজনই ছিলোনা। যারা বিল পাশ করছেন তারা সব বোঝেন, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর অন্ধভক্তরা এসব কবে বুঝবেন? প্রশ্ন উঠেছে, মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ড এর আচরণ, 'দ্য মুসলিম ওম্যান বিল ২০১৭ 'এর উদ্দেশ্য, অবিজেপি রাজনৈতিক দলের আলপটকা মন্তব্য এবং ভূমিকা নিয়েও (জানিনা কেন হটাৎ রাহুল গান্ধী ২০১৯ সালে মন্তব্য করেছিলেন-কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে তিন তালাক আইন বাতিল করবেন)। আপাতত তিন তালাক বিলটি জম্মু কাশ্মীর বাদে পুরো ভারতেই চালু হবে। সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রায়ই দেশের আইন। সেই অনুযায়ী তাৎক্ষণিক তালাক এখন বৈধ বা গ্রাহ্য নয়।

২০১৯ সালে, জনৈক ব্যক্তির সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়া একটি ভাইরাল পোস্টে তুলে ধরলাম - "সংসদের উভয় কক্ষেই ইতিমধ্যে পাশ হয়ে গিয়েছে তিন তালাক বিল। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে বুধবার থেকেই তা পরিণত হয়েছে আইনে। এই আইন মোতাবেক কোনও ব্যক্তি যদি তাঁর স্ত্রীকে তাৎক্ষনিক তিন তালাখ দেন তাহলে তিন বছর পর্যন্ত কারাবাসের সাজা হতে পারে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বিলটির প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য।

তাৎক্ষনিক তিন তালাখ এখন একটি ফৌজদারি অপরাধ। এর সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বছরের জেল। অভিযুক্ত স্বামী আদালতে জামিনের আবেদন জানালে শুধুমাত্র পুলিশের বক্তব্য শুনেই তার ফয়সালা করতে পারবেন না বিচারক। তিন তালাক আইনের সেকশন ৭ (সি) অনুযায়ী যে মহিলাকে তাৎক্ষনিক তিন তালাখ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর বক্তব্যও এক্ষেত্রে শোনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু বাধ্যতামূলক নয়, সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে অভিযোগকারিণী মহিলার বক্তব্যকেই।

আইনের ভাষায় তিন তালাক দেওয়া একটি কম্পাউন্ডেবেল অপরাধ। অর্থাৎ অভিযোগকারিণী যদি চান, সেক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারেন অভিযুক্ত স্বামী। তিন তালাক আইনের ৭ (বি) ধারায় বলা হয়েছে অভিযোগকারিণী স্ত্রী যদি চান তাহলে তিনি তাঁর স্বামীকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারেন। যদিও বিচারক মনে হলে কিছু বাড়তি শর্তাবলিও যুক্ত করতে পারেন অভিযুক্তের মুক্তির ক্ষেত্রে।

তিন তালাক আইন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি যদি তাঁর স্ত্রীকে আইন মেনে তালাক দেন, তাহলে সেই দম্পতির নাবালক সন্তানদের নিজের হেফাজতে চাইতে পারবেন না স্বামী। এছাড়াও নাবালক সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীর থেকে খোরপোশ পাবেন স্ত্রী। কেবল মাত্র নাবালক

সন্তানদের জন্যই নয়, বাকি নির্ভরশীল সন্তানদের জন্যও খোরপোশের আবেদন জানাতে পারবেন বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রী।
এছাড়াও বিচার প্রক্রিয়ায় গতি আনতে আইনে বলা হয়েছে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসেই হবে তালাক মামলার শুনানি। দাম্পত্য বিবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় দেখা গিয়েছে বাড়ি থেকে আদালতের দুরত্ব বেশি হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধায় পড়েন মহিলারা। সেই সমস্যার সুরাহা করতেই সরকারের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।"

অন্যদিকে ভারতে বসবাসকারী সেইসব ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিদের (যারা নিজেদেরকে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে দাবী জানান)ও আজ এটা বুঝে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন যে, তিন তালাক যখন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় এবং ইসলাম একে সমর্থনও করেনা তখন আপনাদেরই উচিৎ এগিয়ে আসা এবং এর বিরোধিতা করা। মনে রাখবেন সরকারের দুর্নীতি, শোষণ, ফ্যাসিবাদ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাদি কাজকর্মের বিরোধীতা এবং একটি প্রাচীন কু-প্রথা বাতিলের বিরোধীতা এক জিনিস নয়। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, আরব অঞ্চলে 'ইদ্দা' নামক এক ধর্মীয় বিধান রয়েছে। এই বিধান মতে, স্বামী তার স্ত্রীকে তিন মাসের জন্য 'তালাক ' দিতে পারে এবং তিন মাস পরে আবার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করতে

পারে। এই মধ্যবর্তী সময়ে স্বামী কোনও নারীকে স্ত্রী করে তার চারটি স্ত্রী রাখার ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখতে পারে। ধর্মের সূত্র ধরে মরোক্কোর সংবিধানে স্ত্রীকে স্বামীর আইনি ক্রিতদাসী করা হয়েছে। ও দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে -স্ত্রী বাধ্য ও বিশ্বস্ত থাকবে স্বামীর কাছে, স্বামীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের সম্মান রক্ষা করবে। স্ত্রী যদি তার মা- বাবাকেও দেখতে চায়, তাহলে স্বামীর অনুমতি নিতেই হবে (সূত্র- The Sisterhood of Man, by Newland Kathleen : W.W.Norton & Co..New York : 1979, Page- 24)। আপনারা যদি সত্যিই নারীকে "মানুষ" হিসেবে মনে করেন, যদি আপনারা নারী প্রগতি ও নারীপুরুষের সাম্য চান তাহলে সমস্তরকম কু-প্রথা, যুক্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার অনুষ্ঠান এবং কুসংস্কারের বিরোধীতা করুন। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের উচিৎ, সুপ্রিম কোর্টের রায় ও পাশ হওয়া এই বিলটিকে সম্মান জানানো।

তিন তালাক এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা হচ্ছিল ওসমান মল্লিক সমেত কয়েকজন সংবিধান এবং আইনিবিশেষজ্ঞদের সাথে। এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্পর্কে ওসমান বাবু জানিয়েছেন -

"সংবিধানের খসড়া বা ড্রাফটে ইউনিফর্ম সিভিল কোড ছিল ৩৫ নম্বর আর্টিকেল এর অন্তর্গত। সংবিধান সভায় এটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। মুসলিম সদস্যদের দিক

থেকে এর জোরালো প্রতিবাদ হয়। বেশিরভাগ মুসলিম সদস্যদের বক্তব্য ছিল মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অলঙ্ঘনীয়। এই আইনে কোনো পরিবর্তন আনা যাবেনা। তাই ইউনিফর্ম সিভিল কোড এর কথা সংবিধানে থাকা চলবেনা।

২০১১ সালে সেকুলারিজম এর আদর্শকে পাথেয় করে আমরা একটি সংগঠন গড়ি। নাম- 'সেকুলার মিশন'। মূলত : সেকুলার স্টেট ও সেকুলার ফ্যামিলি এর আদর্শেকে প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সংগঠন। এরই মাঝে আমরা একটি উদ্যোগ নিয়েছিলাম - ইউনিফর্ম সিভিল কোড এর ড্রাফট তৈরীর। আপনাদের সকলকে জানাই সেই ড্রাফট এখন রেডি। A Complete Draft of Uniform Civil Code of India 06th December 2021 জমা পড়েছে law Commission সহ বিভিন্ন দপ্তরে। Marriage, Divorce, Maintenance, Succession, Adoption ও Guardianship -এই সব কটি বিষয়ই এই কোডের অন্তর্গত। রয়েছে ১১৫ টি সেকশন ও ৫টি তপশীল।

কি আছে এই ড্রাফটে? চেষ্টা করছি আমরা একটি বাংলাতে বই বের করার। তার পরিশিষ্ট অংশ থাকবে এই ড্রাফট। সব ঠিক ঠাক এগোলে আগামী বইমেলাতেই আপনারা হাতে পাবেন এই বইটি। এখানে এই খসড়ার দু একটি সেকশন তুলে ধরছি :

1. (2): It extends to the whole of India, and applies to all citizens of India, irrespective of their religion, caste, creed, and custom

3. (b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to apply in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act.

(c) any practice, custom, or usage, in contravention of this Act, shall be treated null &void, ineffective, and illegal.

(d) there is no bar to practicing rituals or customs, subject to public order, decency, morality, and mutual consent of the parties, but no such customs or rituals shall have the status of Law.

লেখাটি শেষ করবার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে আরেকবার চোখ বোলানো যাক।

১) ৩১ জুলাই ২০১৯-তিন তালাক বিরোধী আইন পাশ করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। এর পুরো নাম- "The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bills, 2019"। ২০১৭-র ১৮ মে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে এই আইন পাশ হয়।

২) ২০১১-র জনগণনা অনুসারে দেশের আট শতাংশ মহিলা মুসলিম। ১৫ অক্টোবর, ২০১৫- বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলারা বৈষম্যের শিকার কি না তা দেখার জন্য প্রধান বিচারপতিকে জানায় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

৩) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬- উত্তরাখণ্ড ভারতের বাসিন্দা শায়রা বানু একটি পিটিশন দায়ের করেন । তিনি আদালতকে জানান, উত্তরাখণ্ডে বাপের বাড়িতে গেছিলেন চিকিৎসার জন্য। সেইসময় তাঁর শওহর অর্থাৎ স্বামী তাঁকে একটি চিঠি পাঠান। ওই চিঠিতে তাৎক্ষণিক তালাক দেন শায়রার শওহর এরপর ১৫ বছর ধরে শওহরের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি তিনি । এমনকী তাঁর সন্তানদের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন শায়রা। শায়রার শওহর এলাহাবাদে থাকতেন । আদালতের কাছে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বন্ধের আর্জি জানান তিনি পাশাপাশি শায়রা জানান, মুসলিম ব্যক্তিরা তাঁদের বিবিদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬- অ্যাটর্নি জেনেরাল মুকুল রোহাতগিকে এই বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন।

৪) ২৮ মার্চ, ২০১৬- 'মহিলা এবং আইন : পারিবারিক আইনের মূল্যায়ন এবং বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনের উপর লক্ষ্য'-বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের রিপোর্ট তৈরির জন্য কেন্দ্রকে

নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। স্বতঃপ্রণোদিত এই মামলায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (AIMPLB)-এর মতো বহু সংস্থাকে যুক্ত করে শীর্ষ আদালত ।

৫) ২৯ জুন, ২০১৬- সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ‘‘সাংবাধিনাকি পরিকাঠামোর কষ্টি পাথর’’-এ বিচার হবে ‘তিন তালাক’। ৭ অক্টোবর, ২০১৬- সাংবিধানিক ইতিহাসে প্রথমবার শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার তিন তালাকের বিরোধিতা করে। লিঙ্গ-বৈষম্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বিষয়ে ভেবে দেখার কথা জানায় কেন্দ্র। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭- মূল মামলার সঙ্গে আরও কয়েকটি আলোচনামূলক আবেদন যুক্ত করার অনুমতি দেয় শীর্ষ আদালত। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭- পাঁচ বিচারপতিকে নিয়ে একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গড়ে সুপ্রিম কোর্ট। ওই বেঞ্চে তিন তালাক ও নিকাহ হালালা সংক্রান্ত যাবতীয় শুনানি ও আলোচনা হয়।

৬) মার্চ, ২০১৭ - AIMPLB সুপ্রিম কোর্টকে জানায়, তিন তালাকের বিষয়টি বিচার ব্যবস্থার এক্তিয়ারের মধ্যে পরে না। ১৮ মে, ২০১৭- তিন তালাক সংক্রান্ত মামলার রায়দান স্থগিত রাখে। ২২ অগাস্ট, ২০১৭- তিন তালাককে বেআইনি বলে ঘোষণা করে শীর্ষ আদালত এবং কেন্দ্রকে এই বিষয়ে আইন পাশ করানোর কথা জানায়। ডিসেম্বর, ২০১৭- লোকসভায় পাশ হয় মুসলিম মহিলা (বিবাহের অধিকারের সুরক্ষা) বিল।

৯অগাস্ট, ২০১৮- তিন তালাক বিলের সংশোধনীতে অনুমতি দেয় কেন্দ্র। ১০ অগাস্ট, ২০১৮- রাজ্যসভায় পেশ করা হয় তিন তালাক বিল। সমর্থন না পাওয়ায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পর্যন্ত পিছিয়ে যায় বিল পাশ ।১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮- মন্ত্রিসভায় অর্ডিন্যান্স পাশ হয় । তিন তালাককে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং অপরাধ প্রমাণ হলে তিন বছরের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৭) ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮- বিরোধীরা রাজ্যসভার নির্বাচিত প্যানেলের দ্বারা বিলের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায়। ২০ জুন, ২০১৯ - রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে তিন তালাক বিল পাশের আর্জি জানান। ২০ জুন, ২০১৯ - রাজ্যসভায় পেশ হয় মুসলিম মহিলা (বিবাহের অধিকারের সুরক্ষা) বিল। ২১জুন, ২০১৯- লোকসভায় পেশ হয় মুসলিম মহিলা (বিবাহের অধিকারের সুরক্ষা) বিল । ২৫ জুন, ২০১৯- বিরোধীরা ওয়াক-আউট করে । লোকসভায় পাশ হয় তিন তালাক বিল।

৮) ৩০ জুলাই, ২০১৯- রাজ্যসভায় পাশ হয় তিন তালাক বিল। অবশেষে ১ অগাস্ট, ২০১৯ - মুসলিম মহিলা (বিবাহের অধিকারের সুরক্ষা) বিল বলবৎ হয়। তিন তালাক কে বেআইনি ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট।

পরিশেষে শুধু একটাই কথা রয়ে যায়, যা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলে গেছেন। উনি বলেছিলেন - "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে, আমরা তখনও বসে/ বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি, ফিকাহ ও হাদিস চষে।"

"মাজারে মানুষ আসবেই। মানুষ আসবে কারণ সে দুর্বল, অসহায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।"

\- আহমদ ছফা

রাজনীতিক নজরুল

লি খে ছেন - সং কে ত হ ক



১৮৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এখনকার পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়াতে জন্ম নিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। অনবদ্য সৃষ্টির জন্য গোটা বাঙালি জাতি তাঁকে সম্মান করে। মূলত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তিনি পরিচিত হলেও তাঁর প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। তিনি কথক, নাট্যকারও। নজরুলের সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখা হয় নি। একজন পুরোদস্তুর সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী বলতে যা বোঝায়, আমার কাছে নজরুল সেরম ব্যাক্তি।

নজরুল যখন জন্মেছিলেন তখন আমাদের দেশটা ব্রিটিশের গোলাম। সমাজের প্রতিটি কোণে তাদের নির্মম শাসন দেখতে দেখতে তিনি বড় হচ্ছিলেন। দেশকে স্বাধীন করার

আন্দোলন অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছিলো। সমাজ সচেতন নজরুলও এই আন্দোলনে শরীক হয়ে উঠলেন। আর এ-কাজে তিনি ব্যবহার করেছেন নিজের কবিতা-গানকে। তাঁর লেখার মাধ্যমে দেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন – এক হয়ে একটা ফ্রন্ট গঠন করার জন্য, লুঠেরা ব্রিটিশদের দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য। একের পর এক লেখায় উস্কে দিতে চেয়েছেন বাঁধভাঙা ব্রিটিশ বিরোধী আবেগ।

১৯২২ সালে শ্রাবণ মাসে তাঁর সম্পাদনায় কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয় 'ধূমকেতু' পত্রিকা। আশ্বিনের শেষে এই পত্রিকায় 'ধূমকেতুর পথ' কলমে তিনি লেখেন[১]:

"ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ন দায়িত্ব,...শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজ্য বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততারি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না।...আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"

খোলাখুলি ব্রিটিশকে এমন চ্যালেঞ্জ সত্যি অবাক করার মত ছিলো। 'ধূমকেতু' পত্রিকা নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমেদ লিখেছেন[২]:

"...অতিমাত্রায় নিরুপদ্রবতা প্রচারের ফলে দেশ খানিকটা মিইয়ে গিয়েছিলো। এই মিয়ানো হতে নজরুল তার লেখার ভিতর দিয়ে দেশকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছিলো।...."

ব্রিটিশরাও তাঁকে ছেড়ে কথা বলে নি। ১৯২২ সালে এই পত্রিকার ১২তম সংখ্যায় নজরুল একটি কবিতা লিখেছিলেন – 'আনন্দময়ীর আগমনে'। পরের বছর নভেম্বর মাসে এই কবিতা লেখার জন্য পুলিশ আজকের বাংলাদেশে কুমিল্লায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

বছর শেষ হতেই আদালতের রায়ে পরাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(ক) আর ১৫৩(ক) ধারা অনুযায়ী তাঁর ১ বছরের সশ্রম জেল হয়। এ-সম্বন্ধে নজরুল নিজেই লিখেছেন[৩]:

"সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই..."


ধূমকেতু

সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে।

সম্পাদক—কাজী নজরুল ইসলাম

শুক্রবার—২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৯; ১১ই আগষ্ট, ১৯২২

সূচি

'ধূমকেতু'-সারথি "বিদ্রোহী"র বৈদিক-কবি

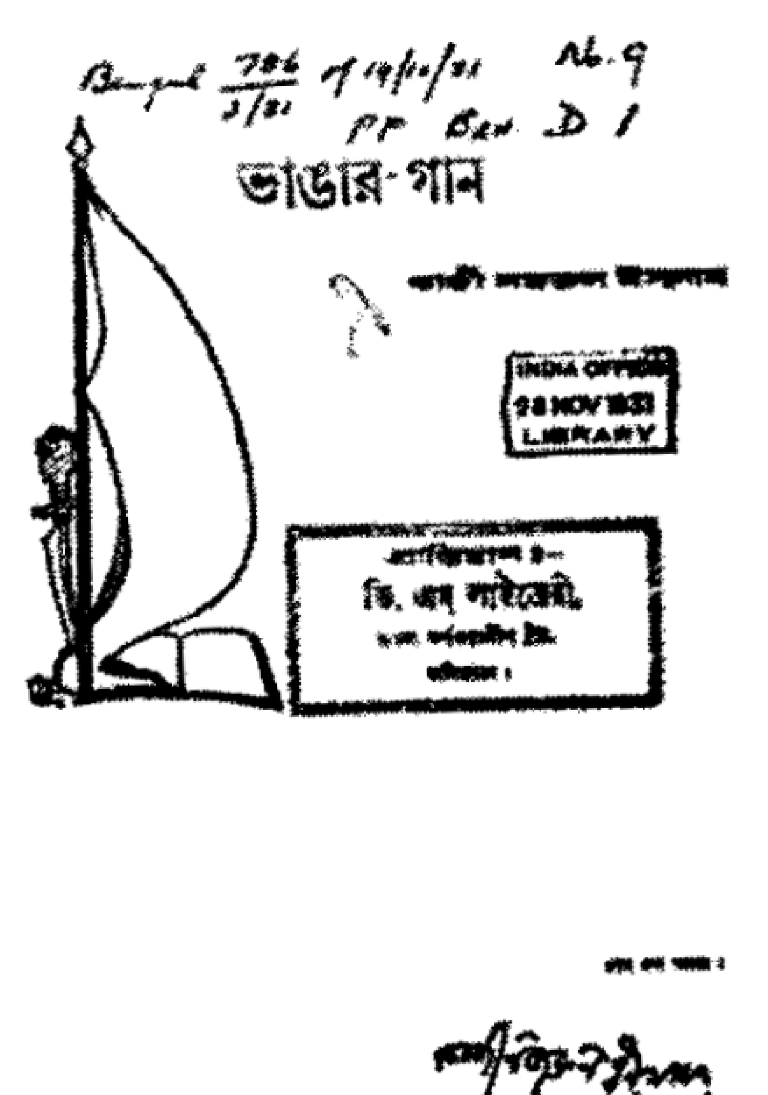
কাজী নজরুল ইসলাম-এর

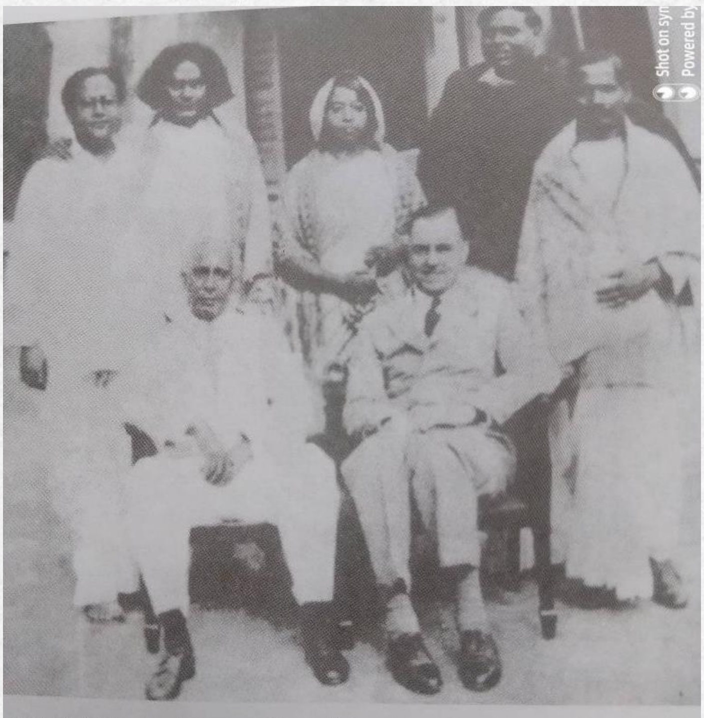
কবিতার বই

অগ্নি-বীণা! অগ্নি-বীণা!!

হিমানী

Printed and Published by M. Afzal-ul Haque from the Metcalfe Press, 79, Balaram Dey Street, Calcutta.





কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানিতে। দাঁড়িয়ে (বাম দিক থেকে) : ধীরেন দাস, নজরুল, আঙ্গুরবালা, তুলসী লাহিড়ী, রাসবিহারী শীল। বসে : ভগবতী ব্যানার্জি

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নজরুল গীতিকার-সুরকার হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তাঁর অনেক গান ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াই-এর নতুন কর্মসূচী হয়ে ওঠে। 'হায় পলাশী' গানে তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন:

"হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি,
পলাশী, হায় পলাশী।।
আত্মঘাতী স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুম্কুম্,
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ কুসুম।..."

আবার অন্যদিকে 'ভাঙার গান'-এ লিখলেন:

"...মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!..."

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী যুগে স্বদেশী গান লিখিয়েরাও তৎকালীন শাসক বিরোধী বিদ্বেষের সুরকে এত জোরের সঙ্গে

ধরতেন না। এই আওয়াজটাকে তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে নজরুল 'একা কুম্ভ' ছিলেন। তাই, স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে আপোষহীন বিপ্লবীরা নি:সংকোচে তাঁর গানের আগুন ঝরা শব্দে অনুপ্রাণিত হলো। স্বভাবতই, ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে একেবারেই পাত্তা দেয় নি। তারপর যখন সবাই কানাকানি করতে লাগলো যে রেকর্ডে নজরুলের গান নেই কেন, তখন কোম্পানির টনক নড়েছিলো। তারা বুঝেছিলো নজরুলকে এড়িয়ে চললে তাদেরই ব্যবসা মার খাবে। তখন থেকে কোম্পানির রেকর্ডে তিনি আমন্ত্রিত হলেন।

তখনকার দিনে কেউ স্বাধীনতা-সংগ্রামকে খোলাখুলি সমর্থন করলেই ইংরেজ প্রভুরা ভাবতো ব্যাটা নির্ঘাত রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে। সেই হিসেবে নজরুল ছিলো শাসকের কাছে সম্পূর্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তি।

পরাধীন দেশে মানুষের কাছে আরও তিনটে সংকট ছিলো – ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, নারী-পুরুষ বৈষম্য আর ধনী-গরিব বিরোধ। নজরুল বুঝেছিলেন দেশের ভালো করতে গেলে শুধু ইংরেজকে তাড়ালেই হবে না, সেই সঙ্গে এগুলোকেও কাটাতে হবে। তাই তাঁর লেখাতে পাওয়া যায় সাম্য, সত্য এবং ন্যায়-বিচারের প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা।

'সাম্যবাদী(মানুষ)' কবিতায় লেখেন:

"গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি!...”

এই কবিতায় ধর্মের বেড়াজাল ভেঙ্গে দেশের হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার আবেদন ছিলো। আবার, লিঙ্গ-সাম্য নিয়ে ‘সাম্যবাদী(নারী)’ কবিতায় লিখলেন:

“বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।...”

এত চাঁছা-ছোলা ভাষায় বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ সাম্যের দাবী করেনি। অপরদিকে, তিনি প্রান্তিক মানুষের সামাজিক ন্যায় বিচারের অধিকারের দাবীকে তুলে এনেছেন তাঁর কবিতায়। কুলি মজুরের কষ্ট দেখে লিখেছিলেন:

“দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?...”

এ-সব পড়ে যদি মনে করা হয় নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধীতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলো, তাহলে খুব ভুল হবে। কেননা শুধু বিদেশী শাসন নয়, সমাজে সবরকমের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। বিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় তিনি লিখেছেন:

"...যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না –
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।..."

অর্থাৎ, এ বিদ্রোহ শুধু ইংরেজদের বিরূদ্ধে নয়, বিশ্বের প্রতিটা দেশে যে হাতে গোনা কয়েকজন বেশিরভাগ মানুষকে দাবিয়ে রেখেছে, তাদের প্রত্যেকের বিরূদ্ধে ঝরে পড়ছে। বরাবর তাঁর অবস্থান প্রতিষ্ঠান বিরোধী। তার কবিতার লাইন যেন সব রকম সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির স্লোগান হয়ে উঠেছে। ২য় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরূদ্ধে সোভিয়েত দেশ যখন লড়ছে, দুর্ভাগ্যবশত: তখন মানসিক ভাবে তিনি পঙ্গু। যদি সুস্থ থাকতেন নিশ্চয় গান-কবিতায় ভাসিয়ে দিতেন।

নজরুলের ব্যাক্তি জীবনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে রূপোর চামচ মুখে দিয়ে তিনি জন্মাননি। কতরকম কষ্ট পেয়েছেন – বিদ্রুপ, অপবাদ, প্রিয়জনের মৃত্যু শোক, স্ত্রীর পক্ষাঘাত। এত কিছুর পরেও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখার সময় কখনও চুপ করে থাকেনি তাঁর কলম। টাকা-পয়সার অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে যায় নি। বরং, কষ্টগুলো জমাট বেঁধে তাঁকে আরও পোড় খাওয়া করে তুলেছে। লাভের আশায় বা লোভে পড়ে শাসকের কাছে কখনই তিনি বিকিয়ে যান নি। যাই-হোক না কেন তাঁর 'চির উন্নত

শির’। ‘আমার কৈফিয়ত’ কবিতায় তিনি আসলে কি করতে চেয়েছেন তা বলেছেন:

“...রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
...যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।...”

এ-সব থেকে মনে করা যেতেই পারে নজরুলই আমাদের ভাষায় প্রথম রাজনৈতিক কবি। গত শতকের চল্লিশের দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস প্রভৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা সেই ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী। ওই দশকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মী হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী প্রমুখরা গানের জগতে একটা নতুন পর্যায় চালু করেন - ‘গণসঙ্গীত’। ইতিহাসের তথ্য ঘেঁটে বলা যেতে পারে এরও সলতে পাকানোটা শুরু হয়েছিলো নজরুলের লেখা স্বদেশী গানের মধ্য দিয়ে।

আজকের ভারতবর্ষে আমরা দেখছি আবার সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিপদ ফিরে এসেছে। একদিকে দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবনে অভাব-দেনা, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা পাষান স্তুপের মত জমা করে রাখছে গুটি কয়েক পাষন্ড। সামাজিক ন্যায় তো প্রায় সোনার পাথর বাটি। দিকে দিকে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ, রোজ যেমন সূর্য ওঠে, বছরে ৬টা ঋতু আসে, তেমনভাবে এই সংকটগুলো

সমাজ জীবনে নিয়মে পরিণত হচ্ছে। আর এই আক্রান্ত সময়ে দাঁড়িয়েও সমসাময়িক কৃষ্টিবান মানুষেরা অনেক বড় বড় বুলি কপচাচ্ছে; কিন্তু ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার এতটুকু মুরোদ তাদের নেই। তারা কর্মজীবনে যশ চায়, কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। তাই শাসকের সাথে নির্লজ্জ ভাবে সালিশী করে ক্ষমতার বলয়ের ভিতরে থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। উল্টোদিকে দেশের দুঃখী মানুষগুলোকে তারা একটা নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাতেও পারে না।

চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রবল শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করতে যথেষ্ট সাহস লাগে। নজরুল প্রমান করে দিয়েছেন এ সাহস জোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। এর জন্য একদিকে যেমন দরকার দাঁতে দাঁত চেপে থাকা জেদ, আরেকদিকে জনগণের অজেয় শক্তির ওপর বিশ্বাস। এইটেয় সাচ্চা রাজনৈতিক কর্মীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আশা করি, তাঁর অসাধারণ দৃষ্টান্ত আবার দাহ্য বারুদ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আর সেই পাঠ শুনে কোনো তরুণ অথবা তরুণীর ইচ্ছে হতেই পারে নজরুলের মত কলম পেষা রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার।

তথ্যসূত্র:

[১] নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,১৯৮৩

[২] কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা – মুজফফর আহমেদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, অক্টোবর ১৯৬৯

[৩] ‘আমার সুন্দর’, দৈনিক নবযুগ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।

নিবন্ধে দেওয়া ছবি গুলো আন্তর্জাল থেকে নেওয়া

অজানা জ্বর না ডেঙ্গু? চেনার ও পরিত্রাণের উপায় কি?

লিখেছেন – পঞ্চানন মন্ডল



ডাক্তারি পরিভাষায় 'Pyrexia (fever) of Unknown Origin' অর্থাৎ 'অজানা জ্বর'-এর সংজ্ঞা হিসাবে Petersdorf and Beeson বলেছেন -

"A temperature greater than 38.3°C (101°F) on several occasions, accompanied by more

than three weeks of illness, failure to reach a diagnosis after one week of inpatient investigation."

তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে জ্বর, সমস্ত পরীক্ষা করেও যার কারণ জানা যায় না, তাকেই বলে 'অজানা জ্বর'।

ডেঙ্গুর ক্লিনিক্যাল সংজ্ঞাও ভারত সরকারের ইন্টিগ্রেডেড ডিজিজ সারভেইল্যান্স প্রোগ্রামে বলা আছে:-

"২ থেকে ৭ দিনের জ্বর, তার সঙ্গে নীচের যে কোনো দু'টি লক্ষণ-

1. মাথাব্যথা
2. পিছনে ব্যথা
3. পেশীতে ব্যথা
4. গাঁটে গাঁটে ব্যথা
5. রাশ
6. রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কম"

এছাড়াও বলা আছে, যে এলাকায় যে সময় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, **সেখানে সেইসময় যে কোনো জ্বরের কেস যদি রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া নেগেটিভ হয়, তাহলে তাকে ডেঙ্গু বলেই ধরতে হবে (epidemiologically linked Dengue)**। সুতরাং ডেঙ্গুর সঙ্গে অজানা জ্বর গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই।

ডেঙ্গু কনফার্মেশনের জন্য মূলতঃ যে পরীক্ষাগুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(WHO) এবং ভারত তথা পঃ বঙ্গ সরকার দ্বারা স্বীকৃত, সেগুলি হ'ল -

- জ্বর শুরুর পাঁচদিনের মধ্যে ELISA পদ্ধতিতে রক্তে NS1 অ্যান্টিজেনের অস্তিত্ব দেখা।
- জ্বর শুরুর পাঁচদিন পরে ডেঙ্গু-স্পেসিফিক ইমিউনোগ্লোবিন M বা IgM -এর অস্তিত্ব দেখা।
- পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR) পরীক্ষা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরো বলছে -

> "There is no specific treatment for dengue fever. Severe dengue is a potentially lethal complication but early clinical diagnosis and careful clinical management by experienced physicians and nurses often save lives."

অর্থাৎ, ডেঙ্গুর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন চিকিৎসকের পূর্ণ অধিকার আছে রোগীর মৃত্যু হ'লে মৃত্যুর কারণ হিসেবে তাঁর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস লেখার। বিশেষতঃ যেখানে ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের উপর ভিত্তি করেই চিকিৎসা করতে হয়। ডেঙ্গুর এখন মোট পাঁচটি সেরোটাইপ। পঞ্চমটি মালয়েশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ ক'বছর হ'ল, ভারতে এখনো অব্দি রিপোর্টেড নয় এই স্ট্রেইন। তবে তার বাহক এডিস নিভিয়াস কিন্তু এদেশে রয়েছে।



ডেঙ্গুর ইতিহাস

ডেঙ্গুর মশা, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম এডিস ইজিপ্টি, সাধারণত দিনে কামড়ায়। সুতরাং, শুধু রাতেই নয়, দিনের বেলাতেও আমাদের সাবধানে থাকতে হবে, যাতে মশা না কামড়াতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ম্যালেরিয়ার জীবানুবহনকারী মশারা সাধারণত রাতে কামড়ায়। এই মশারা যখন ওড়ে, তখন পোঁ পোঁ করে আওয়াজ হয়। ডেঙ্গুর মশাদের ক্ষেত্রে এরকম আওয়াজ হয় না ঠিকই, কিন্তু এদের চেনার উপায় হচ্ছে গায়ে ডোরাকাটা দাগ।

ডেঙ্গু শব্দটি সোয়াহিলি ভাষা ডিঙ্গা থেকে এসেছে। যার অর্থ সাবধানতা। ডেঙ্গু আক্রান্তরা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথার জন্য খুব ধীরে হাঁটাচলা করেন, মনে হয় যেন সাবধানে চলছেন। সেই থেকে এই ডিঙ্গার ব্যবহার। এই অসুখের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে এক চিনা মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়াতে ২৬৫-৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ডেঙ্গুর মতো

এক অসুখের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম সুনিশ্চিত ডেঙ্গুর কথা পাওয়া যায় ১৭৮৯ সালে, যার ব্যাখ্যা করেন বেঞ্জামিন রাস। তিনি হাড়ভাঙ্গা রোগ বলে অসুখটির বিবরণ দেন। সুতরাং, ডেঙ্গু বহুদিন ধরেই মানুষকে আক্রান্ত করছে।

ডেঙ্গুর প্রকারভেদ -

ডেঙ্গুর কারণ হল ডেঙ্গু ভাইরাস। যার বাহক হল এডিস ইজিপ্টি মশকী। যার কামড়ে মানুষের রক্তে এই ভাইরাস প্রবেশ করে এবং ডেঙ্গু হয়। এটি একপ্রকারের ফ্লাভি ভাইরাস।

ডেঙ্গু চার প্রকারের হয়।

ডেঙ্গু-১, ডেঙ্গু-২,ডেঙ্গু৩, ডেঙ্গু-৪।

ডেঙ্গু-২ অন্য তিন ভাইয়ের থেকে একটু বেশিই আক্রমণাত্মক। রক্তে এদের সংখ্যা বা যাকে বলে ভাইরাল লোড, খুব বেশি থাকে। তার ফলে,এই ডেঙ্গুর দরুণ অন্যান্য প্রতিক্রিয়া বা জটিলতা বেশি হয়। ১৯৯৬ সালে দিল্লিতে ডেঙ্গু-২ এর এপিডেমিক হয়েছিল।

ডেঙ্গুর লক্ষ্মণ -

আগেই উল্লেখ করেছি ডেঙ্গু হলে জ্বর, গায়ে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, পেট ব্যাথা ও চোখের ভেতরে ব্যাথা হতে পারে। গায়ে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যেতে পারে। যে সমস্ত মহিলাদের জ্বরের সময় মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডের সময় হয়ে আসে, তাদের রক্তক্ষরণ অনেক বেশি হয়। ডেঙ্গুতে

শ্বেতরক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা (platelet) কমতে শুরু করে। অনুচক্রিকা কমতে কমতে যদি বিপদ সীমার নিচে চলে যায়, বা অনুচক্রিকা কমার হার যদি অনেকটা হয়, তাহলে চিকিৎসকেরা অনুচক্রিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাকে বলে platelet transfusion। বাজারে পেঁপে পাতার রসের খুব প্রচলন হয়েছে অনুচক্রিকা বাড়ানোর জন্য। কিছু ওষুধের কোম্পানি ট্যাবলেটের আকারে বাজারে বের করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, এর প্রয়োগে অনুচক্রিকা বাড়ে, তা নিশ্চিতভাবে এখনো প্রমাণিত নয়।

এর জন্য আরও ক্লিনিক্যাল স্টাডির প্রয়োজন আছে।
এই অনুচক্রিকা কমে যাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। যেমন নাক, দাঁতের মাড়ি, পাকস্থলী ইত্যাদি। শরীরে চামড়ার তলায় ছোপ ছোপ লালচে দাগ দেখা যেতে পারে। যার অর্থ চামড়ার তলায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। একে ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার বলে। এই রক্তক্ষরণ চলতে থাকলে দেহে রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গে রক্তের সঞ্চালন সঠিক পরিমাণে হয় না। এই ভয়ঙ্কর অবস্থাকে 'ডেঙ্গু শক সিনড্রোম' বলে। এছাড়াও ডেঙ্গুর জন্য পেটে বা ফুসফুসে জল জমতে পারে। যাকে ডেঙ্গু ক্যাপিলারি লিক সিনড্রোম বলা হয়। এর থেকেও শক সিনড্রোম হতে পারে। এছাড়াও, ডেঙ্গির জন্য মানুষের রোগ প্রতিরোধকারী সিস্টেম বা অনাক্রম্যতন্ত্র

বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে। এই ভয়ঙ্কর জটিলতার নাম ম্যাক্রোফাজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম।

কখন হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে?

ডেঙ্গুর NS1 অ্যান্টিজেন পরীক্ষা পজিটিভ এলে।সেইসাথে যদি আপনার পেট ব্যথা হয়, বা খুব বমি হয়, পেটে বা ফুসফুসে জল জমে, অথবা রক্তক্ষরণ হয়।আর অণুচক্রিকার পরিমাণ দ্রুত কমতে থাকে।

ডেঙ্গুর পরীক্ষা

ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম এক থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে NS1 অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করলে ডেঙ্গু ধরা পড়তে পারে। সুনিশ্চিত পরীক্ষার জন্য ডেঙ্গু সেরোলজি পজিটিভ আসে জ্বর শুরুর ৬ দিনের পর থেকে।

কী করে বুঝবেন কারো ডেঙ্গু হয়েছে?

- কমপক্ষে ৫ দিন ধুম জর থাকবে।
- ওষুধ খেলেও কিছু ক্ষণের জন্য জ্বর কমলেও তা বারে বারে ফিরে আসবে।
- মাথা ও চোখের পিছনদিক-সহ গোটা শরীরে ব্যথা ও দুর্বলতা অনুভব করবেন।
- চামড়ায় র‍্যাশ হতে পারে।

- বমি, ডায়েরি, সর্দি কাশি হলে বেশিদিন ফেলে রাখবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।
- হেমারেজিক ডেঙ্গুতে অনেক সময় মাড়ি ও নাক থেকে রক্তপাত হয় ।
- প্রস্রাব ও মলের সঙ্গেও রক্তপাতের সম্ভাবনা।
- হঠাৎ করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।

ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে বাঁচতে, কি কি করবেন?

- যেকোনো ভাবেই আপনার এলাকাই মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করুন।
- আবর্জনা পরিষ্কার করুন ।পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- জল যাতে না জমে সেদিকে বিশষ নজর রাখুন।
- মশা মারা তেল বা স্প্রে ব্যবহার করুন ।
- খোলা ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা করুন ।
- জ্বর হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
- মশারি ব্যবহার করুন।
- অযথা আতঙ্কিত হবেন না|
- জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষা করুন ।

ডেঙ্গু সংক্রমণে লিভারের বিভিন্ন এনজাইম বেড়ে যায়। এর ফলে লিভারের বিশ্রাম দরকার। কোনও ভাজা-মশলাদার খাবার, তৈলাক্ত খাবার, বাইরের খাবার অন্তত তিন মাস বর্জন করলে লিভার আবার স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে

শুরু করে। খাওয়াদাওয়ায় এই নিয়ন্ত্রণ থাকলে বাড়ি ফিরে ডেঙ্গু রোগী হজমজনিত কোনও সমস্যায় কষ্ট পাবেন না। যাদের প্রথম বার ডেঙ্গু হয়, তাদের ক্ষেত্রে গায়ে লালচে দাগ বেরোয় জ্বর কমার পরেই। আর তখনই লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে প্লেটলেট। এটাই রীতি। তাই জ্বর কমে গেল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া কখনওই উচিত নয়।

এছাড়াও, যাদের আগে ডেঙ্গু হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে জ্বরের সময়েই প্লেটলেট কমে যায়। যাদের প্রথম বার ডেঙ্গু হয়, তাদের কিন্তু গায়ে লালচে দাগ বেরোয় এবং প্লেটলেট কমে জ্বরটা সেরে যাওয়ার পরেই। এটা সবার জানা উচিত।

ডেঙ্গুর সময়ে মেয়েদের কোমরের (পেলভিক অঞ্চলের) বিভিন্ন টিস্যু অতিরিক্ত ফুলে যায়। তাই ডেঙ্গু থেকে সেরে ওঠার ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলে তলপেটে ব্যথা হওয়াটা অস্বাভাবিক কোনও বিষয় নয়। এর জন্য কোনও প্রতিষেধক নিতে হয় না। অনেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আবার না-ও হতে পারে। কার হবে, আর কার হবে না, সেটা আগে থেকে বলা সম্ভবও নয়।

বিভ্রান্তি দূর করে কিছু ক্ষেত্রেও রোগ সেরে যাওয়ার পরে অন্তত মাস তিনেক সতর্ক ভাবে থাকতে হবে।

সচেতন থাকুন। সুস্থ থাকুন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

(আমি ডাক্তার নই। বিভিন্ন বইপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। ভুলত্রুটি থাকলে বিশেষজ্ঞগণ সংশোধন করে দেবেন।)

"বিবর্তন একটি থিয়োরি? বেশ, তাহলে গ্রেভেটিও একটি থিয়োরি কিন্তু আমি কখনো তোমাকে দেখিনি বিল্ডিং থেকে লাফ দিতে।"

- রিচার্ড ডকিন্স

ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন হোন

লিখেছেন - পার্থপ্রতিম পাল



এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস জনিত জ্বর।

ডেঙ্গু জ্বর একটি এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ। এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে পনেরো দিনের মধ্যে সচরাচর ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। উপসর্গগুলির মাঝে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, পেশিতে ও গাঁটে ব্যথা এবং গাত্রচর্মে ফুসকুড়ি। দুই থেকে সাত দিনের মাঝে সাধারণত ডেঙ্গু রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি মারাত্মক রক্তক্ষরী রূপ নিতে

পারে যাকে ডেঙ্গু রক্তক্ষরী জ্বর (ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার) বলা হয়। এর ফলে রক্তপাত হয়, রক্ত অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায় এবং রক্ত প্লাজমার নিঃসরণ ঘটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখনো বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম দেখা দেয়। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। কয়েক প্রজাতির এডিস মশকী (স্ত্রী মশা) ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক। যেগুলোর মধ্যে এডিস ইজিপ্টি মশকী প্রধানতম। ভাইরাসটির পাঁচটি সেরোটাইপ পাওয়া যায়। ভাইরাসটির একটি সেরোটাইপ সংক্রমণ করলে সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে রোগী আজীবন প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে কিন্তু ভিন্ন সেরোটাইপের বিরুদ্ধে সাময়িক প্রতিরোধী ক্ষমতা অর্জন করে। পরবর্তীতে ভিন্ন সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমিত হলে রোগীর মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কয়েক ধরনের টেস্টের মাধ্যমে, যেমন, ভাইরাসটি বা এর আরএনএ প্রতিরোধী এন্টিবডির উপস্থিতি দেখেও ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয় করা যায়।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধী টিকা কয়েকটি দেশে অনুমোদিত হয়েছে তবে এই টিকা শুধু একবার সংক্রমিত হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর। মূলত এডিস মশার কামড় এড়িয়ে চলাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তাই মশার আবাসস্থল ধ্বংস করে মশার বংশবিস্তার প্রতিরোধ করতে হবে। এ জন্য এডিস মশার বংশবিস্তারের উপযোগী বিভিন্ন

আধারে, যেমন, কাপ, টব, টায়ার, ডাবের খোলা, গর্ত, ছাদ ইত্যাদিতে আটকে থাকা জল অপসারণ করতে হবে। শরীরের বেশির ভাগ অংশ ঢেকে রাখে এমন পোশাক পরিধান করতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর হলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং বেশি করে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল দেওয়া হয়। প্রায়শ রোগীর শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে। মারাত্মক রূপ ধারণ করলে রোগীকে রক্ত দিতে হতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরে হলে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক ও ননস্টেরয়েডাল প্রদাহপ্রশমী ওষুধ সেবন করা যাবে না, করলে রক্তপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে ডেঙ্গু একটি বৈশ্বিক আপদে পরিণত হয়েছে। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের ১১০টির অধিক দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হয়। প্রতি বছর পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে সংক্রমিত হয় এবং তাদের মাঝে দশ থেকে বিশ হাজারের মতো মারা যায়।

১৭৭৯ সালে ডেঙ্গুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ডেঙ্গুর ভাইরাস উৎস ও সংক্রমণ বিশদভাবে জানা যায়। মশক নিধনই বর্তমানে ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়। সরাসরি ডেঙ্গু ভাইরাসকে লক্ষ্য করে ওষুধ উদ্ভাবনের গবেষণা চলমান রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য

সংস্থা বিশটি অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের একটি হিসেবে ডেঙ্গু চিহ্নিত করেছে।

চিহ্ন ও উপসর্গ—

সাধারণভাবে, ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্তরা হয় উপসর্গবিহীন (৮০%) অথবা সাধারণ জ্বরের মত সামান্য উপসর্গ।

বাকিদের রোগ হয় আরো জটিল(৫%), এবং স্বল্প অনুপাতে এটি প্রাণঘাতী হয়।ইনকিউবিশন পিরিয়ড(উপসর্গসমূহের সূত্রপাত থেকে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়) স্থায়ী হয় ৩-১৪ দিন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয় ৪-৭ দিন।

অতএব, আক্রান্ত এলাকা - ফেরত পর্যটকদের ডেঙ্গু হয় না যদি ঘরে ফেরার ১৪ দিনের বেশি পরে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ শুরু হয়। বাচ্চাদের প্রায়ই এই উপসর্গগুলি হয় যা সাধারণ সর্দি এবং গ্যাস্ট্রোএন্টারাটাইটিস (বমি ও ডায়েরিয়া) সমান, আর সাধারণতঃ বড়দের চেয়ে উপসর্গের তীব্রতা কম হয়,কিন্তু রোগের জটিলতার শিকার বেশি পরিমাণে হয়।

ডেঙ্গু উপসর্গের বৈশিষ্ট্য হ'ল হঠাত জ্বর হওয়া, মাথাব্যথা (সাধারণতঃ দু'চোখের মাঝে), মাংশপেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা, এবং র‍্যাশ বেরোনো।

ডেঙ্গুর আরেক নাম "হাড়-ভাঙা জ্বর" যা এই মাংশপেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা থেকে এসেছে। মেরুদন্ড ও কোমরে ব্যাথা হওয়া এ রোগের বিশেষ লক্ষণ।

সংক্রমণের কোর্স তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত: প্রাথমিক, প্রবল এবং আরোগ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে অত্যধিক জ্বর, প্রায়শ ৪০ °সে (১০৪ °ফা)-র বেশি, সঙ্গে থাকে সাধারণ ব্যথা ও মাথাব্যথা; এটি সাধারণতঃ দুই থেকে সাতদিন স্থায়ী হয়।

এই পর্যায়ে ৫০-৮০% উপসর্গে র‍্যাশ বেরোয়। এটা উপসর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে লাল ফুসকুড়ি হিসাবে দেখা দেয়, অথবা পরে অসুখের মধ্যে (দিন ৪-৭) হামের মত র‍্যাশ দেখা দেয়।

কিছু petechia (ছোট লাল বিন্দু যেগুলি ত্বকে চাপ দিলে অদৃশ্য হয় না, যেগুলির আবির্ভাব হয় ত্বকে চাপ দিলে এবং এর কারণ হচ্ছে ভগ্ন রক্তবাহী নালী) এই জায়গায় আবির্ভূত হতে পারে,এবং কারুর মুখ ও নাকের মিউকাস মেমব্রেন থেকে অল্প রক্তপাতও হতে পারে।

কিছু লোকের ক্ষেত্রে অসুখটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার কারণে প্রবল জ্বর হয় এবং সাধারণতঃ এক থেকে দুই দিন স্থায়ী হয়।

এই পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে তরল বুক এবং অ্যাবডোমিনালক্যাভিটিতে বর্ধিত ক্যাপিলরি শোষণ ও লিকেজের কারণে জমে। এর ফলে রক্তপ্রবাহে তরলের পরিমাণ কমে যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায়। এই পর্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা এবং প্রবল রক্তপাত হয়, সাধারণত গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট হতে পারে।

ডেঙ্গুর সব ঘটনার ৫%-এরও কম ক্ষেত্রে শক (ডেঙ্গু শক সিনড্রোম) এবং হেমারেজ (ডেঙ্গুহেমারেজিকফিভার) ঘটে। তবে যাদের আগেই ডেঙ্গু ভাইরাসের অন্যান্য স্টিরিওটাইপ-এর সংক্রমণ ঘটেছে ("সেকেন্ডারি ইনফেকশন") তারা বর্ধিত বিপদের মধ্যে রয়েছেন।

এরপর আরোগ্য পর্যায়ে বেরিয়ে যাওয়া তরল রক্তপ্রবাহে ফেরত আসে। এটি সাধারণতঃ দুই থেকে তিনদিন স্থায়ী হয়। এই উন্নতি হয় চমকে দেবার মত, কিন্তু এতে প্রচন্ড চুলকানি এবং হৃদস্পন্দনের গতি ধীরহতে পারে। আরেক রকম র‍্যাশও বেরোতে পারে ম্যাকুলোপাপুলার বা ভাস্কুলাইটিক রূপে, যার ফলে ত্বকে গুটি বেরোয়। এই পর্যায়ে তরলের অতিপ্রবাহ অবস্থা ঘটতে পারে। যদি এতে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় তাহলে সচেতনতার মাত্রা হ্রাস অথবা

মুর্ছা যাওয়া হতে পারে। এর পর এক ক্লান্তির অনুভূতি অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে।

সম্পর্কিত সমস্যা — মাঝে মাঝে ডেঙ্গু অন্যান্য অনেক শরীরতন্ত্রকে আক্রমণ করতে পারে,আলাদা ভাবে অথবা চিরাচরিত ডেঙ্গু লক্ষণের সাথে ০.৫%-৬% চরম ক্ষেত্রে সচেতনতার মাত্রা হ্রাস পায় যার কারণ মস্তিষ্কে ভাইরাসের সংক্রমণ অথবা পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবনতি, উদাহরণস্বরূপ—লিভার।

ডেঙ্গুর সাপেক্ষে অন্যান্য নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের বিষয়ে জানা গেছে, যেমন ট্রান্সভার্স মায়েলিটিস এবং গুলেন-বারে সিনড্রোম দুর্লভতর জটিলতার মধ্যে আছে হৃদপিন্ডে সংক্রমণ এবং অ্যাকিউট লিভার ফেলিওর।

কারণ—ভাইরোলজি পরিবাহক—এডিস মশা

ডেঙ্গু ভাইরাস প্রাথমিকভাবে এডিস মশা দ্বারা পরিবাহিত হয়। এই ভাইরাসের প্রাথমিক ধারক মানুষ,কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাইমেটিদেরদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। একবারের কামড়ালেই সংক্রমণ হতে পারে। স্ত্রী মশা ডেঙ্গু আক্রান্তর রক্তপান করে নিজে সংক্রমিত হয় ও পেটে ভাইরাস বহন করে। প্রায় ৮-১০ দিন পর ভাইরাস মশার দেহের অন্যান্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে আছে মশার লালাগ্রন্থি এবং শেষে এর লালায় চলে আসে। সারা

জীবনের জন্য আক্রান্ত হলেও মশার উপর এই ভাইরাসের কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে না। এডিস ইজিপ্টি" কৃত্রিম জলাধারে ডিম পাড়তে, মানুষের সবচেয়ে কাছে থাকতে এবং অন্যান্য মেরুদন্ডীদের চাইতে মানুষের রক্ত খেতে বেশি পছন্দ করে।

রোগের প্রকৃতি—

শিশু ও ছোট বাচ্চাদের মধ্যে রোগের প্রাবল্য বেশি দেখা যায় এবং অন্যান্য সংক্রমণের তুলনায় এটি বাচ্চাদের পক্ষে বেশি সাধারণ আর এর পরিচর্যা তুলনামূলকভাবে ভাল। এতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বিপদ বেশি। যাদের ক্রনিক অসুখ আছে যেমন— ডায়াবিটিস ও অ্যাজমা তাদের পক্ষে ডেঙ্গু প্রাণঘাতী হতে পারে।

রোগ নিরূপণ সতর্ক লক্ষন—

পেট ব্যাথা বমি যকৃৎ বড় হয়ে যাওয়া পেশিতে রক্তক্ষরণ অনুচক্রিকা কমে যাওয়া। ডেঙ্গুর রোগনিরূপণ সাধারণতঃ ক্লিনিক্যালি হয়, উপসর্গসমূহের রিপোর্ট ও শারীরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে; এটি বিশেষ করে মহামারী এলাকায় প্রযুক্ত হয়। তবে, রোগের প্রাথমিক পর্যায়কে অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণ থেকে আলাদা করা শক্ত হতে পারে।

ল্যাবোরেটরি পরীক্ষায় প্রাথমিক যে পরিবর্তন ধরা পড়ে তা হ'ল শ্বেত রক্তকোষ কাউন্টে হ্রাস, যার পর হতে পারে

অনুচক্রিকার হ্রাস এবং মেটাবোলিক অ্যাসিডোসিস। প্রবল অসুখে, প্লাজমা লিকেজের কারণে হয় হেমোকন্সেন্ট্রেশন (হেমাটোক্রিট বৃদ্ধিতে বোঝা যায়) এবং হাইপোঅ্যালবুমিনিমিয়া। অনেক জায়গায় উপলভ্যতার অভাবের কারণে আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

প্রতিরোধ—

ডেঙ্গু ভাইরাসের কোন স্বীকৃত টিকা ভ্যাকসিন নেই।

সুতরাং প্রতিরোধ নির্ভর করে জীবাণুবাহী মশা নিয়ন্ত্রণ এবং তার কামড় থেকে সুরক্ষার উপর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পাঁচটি মৌলিক দিশাসমেত সংবদ্ধ একমুখী নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সুপারিশ করেছে:—

(১) প্রচার, সামাজিক সক্রিয়তা, এবং জনস্বাস্থ্য সংগঠন ও সমুদায়সমূহকে শক্তিশালী করতে আইন প্রণয়ন,

(২) স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগসমূহের মধ্যে সহযোগিতা (সরকারী ও বেসরকারী),

(৩) সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করে রোগ নিয়ন্ত্রণে সুসম্বদ্ধ প্রয়াস,

(৪) যে কোন হস্তক্ষেপ যাতে সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে হয় তা সুনিশ্চিত করতে প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং

(৫) স্থানীয় অবস্থায় পর্যাপ্ত সাড়া পেতে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

A. aegypti কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাথমিক পদ্ধতি হ'ল এর বৃদ্ধির পরিবেশকে ধ্বংস করে ফেলা। জলের আধার খালি

করে অথবা কীটনাশক প্রয়োগ করে অথবা এইসব জায়গায় বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্টপ্রয়োগ করে, যদিও spraying with অর্গ্যানোফফেট বা পাইরেথ্রয়েডস্প্রে করাকে খুব লাভজনক ভাবা হয় না। স্বাস্থ্যের উপর কীটনাশকের কুপ্রভাব এবং কন্ট্রোল এজেন্টের ব্যয়বহুলতার কথা মাথায় রেখে পরিবেশ শোধনের মাধ্যমে জমা জল কম করাটাই নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভাল উপায়।মানুষজন পুরো শরীর ঢাকা পোষাক পরে, বিশ্রামের সময় মশারী ব্যবহার করে এবং/বা কীট প্রতিরোধক রাসায়নিক (DEET সবচেয়ে কাজের) প্রয়োগ করে মশার কামড় এড়াতে পারে।

ব্যবস্থাপনা—

ডেঙ্গু জ্বরের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। রোগের লক্ষণের উপর চিকিৎসা নির্ভর করে, বাড়িতে নিয়মিত দেখাশোনার সঙ্গে ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভর্তি করে ইন্ট্রাভেনাস থেরাপি এবং/বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন পর্যন্ত। সাধারণতঃ হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে উপরের সারণীর তালিকাভুক্ত “বিপদসূচক চিহ্ন”-এর উপর, বিশেষ করে যাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা আগে থেকেই আছে।

সাধারণতঃ ইন্ট্রাভেনাস হাইড্রেশনের প্রয়োজন মাত্র এক কি দুইদিন পড়ে। urinary output আয়তনিক বিশ্লেষণে

ফ্লুইড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হার— ০.৫-১ মিলি/কেজি/ঘন্টা, স্থিতিশীল ভাইটাল সাইন এবং হেমাটোক্রিট-এর স্বাভাবিকীকরণ।

আগ্রাসী মেডিক্যাল পদ্ধতি, যেমন— ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক ইন্টিউবেশন, ইন্ট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশন এবং আর্টারিয়াল পাংচার এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এতে রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে।

জ্বর ও অস্বস্তির জন্য প্যারাসিটামল (অ্যাসিটামিনোফেন) ব্যবহার করা হয় আর NSAID যেমন আইবিউপ্রোফেন এবং অ্যাসপিরিন চলা হয় কারণ এগুলি রক্তপাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

আরোগ্য পর্যায়ে ফ্লুইড ওভারলোড আটকাতে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ফ্লুইড ওভারলোড ঘটে এবং ভাইটাল সাইন স্থিতিশীল থাকে তাহলে অতিরিক্ত ফ্লুইড বন্ধ করে দিলেই যথেষ্ট। যদি কোন ব্যক্তি বিপজ্জনক পর্যায়ের বাইরে থাকে, রক্তপ্রবাহ থেকে অতিরিক্ত ফ্লুইড বের করতে লুপ ডিউরেটিক যেমন,ফিউরোসেমাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

এপিডেমিওলজি—

বেশির ভাগ লোকই কোন স্থায়ী সমস্যা ছাড়াই ডেঙ্গু থেকে আরোগ্যলাভ করে। মৃত্যুহার চিকিৎসা ছাড়া ১-৫%,এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসায় ১%-এরও কম;তবে রোগের চরম পর্যায়ে

মৃত্যুহার ২৬%। ১১০টিরও বেশি দেশে ডেঙ্গু মহামারীর আকার নিয়েছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে বছরে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন লোকের মধ্যে এটি সংক্রামিত হয়, যার মধ্যে ৫ লক্ষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়,এবং প্রায় ১২৫০০-২৫০০০ মৃত্যু ঘটে।

আর্থ্রোপড দ্বারা পরিবাহিত সবচেয়ে সাধারণ ভাইরাসঘটিত রোগ,ডেঙ্গুর disease burden হিসাব করা হয়েছে প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় ১৬০০ disability-adjusted life year(সুস্থ থাকার বছর), যা টিউবারকিউলোসিস-এর মত অন্যান্য শৈশব ও ট্রপিক্যাল রোগের সমান। ট্রপিক্যাল রোগ হিসাবে গুরুত্বের দিক দিয়ে ম্যালেরিয়ার পরেই ডেঙ্গুর স্থান, যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ষোলটি অবহেলিত ট্রপিক্যাল রোগের মধ্যে অন্যতম ধরে। ১৯৬০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ডেঙ্গুর ঘটনা ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির কারণ হিসাবে মনে করা হয় শহরীকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি,আন্তর্জাতিক যাত্রার বৃদ্ধি, এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন-এর সম্মিলন।

ভৌগোলিক বিভাজন অনুযায়ী বিষুবরেখার চারপাশে মোট ২.৫ বিলিয়ন জনসংখ্যার ৭০%ই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মহামারীপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে।আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, মহামারীপ্রবণ এলাকা থেকে জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছে এমন লোকেদের মধ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণের হার—২.৯-৮%,এবং এই গোষ্ঠীতে ম্যালেরিয়ার

পর এটি দ্বিতীয় সবচেয়ে সাধারণ সংক্রমণ হিসাবে নিরূপিত হয়েছে।

২০03 পর্যন্ত, ডেঙ্গুকে সম্ভাব্য জৈবসন্ত্রাসের চর হিসাবে ধরা হত, কিন্তু পরবর্তী রিপোর্টগুলিতে এই বিভাজন অপসারিত হয় কারণ দেখা যায় এটি অন্তরিত হওয়া খুবই কঠিন এবং এর কারণে তুলনামূলকভাবে স্বল্প অনুপাতে লোকেদের হেমারেজিক ফিভার হয়।

সব জায়গাতেই, সংক্রামিত লোয়ার প্রাইমেট বা মানুষের শরীরে পরিবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। একে বলে অ্যামপ্লিফিকেশন। শহর চক্র (The urban cycle) মানুষের শরীরে সংক্রমণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ডেঙ্গু সংক্রমণ মূলতঃ শহর ও নগরে আবদ্ধ।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে মহামারী প্রবণ এলাকাগুলিতে গ্রাম, শহর ও নগরের সম্প্রসারণ, এবং মানুষের বর্ধিত চলাচল মহামারীর বৃদ্ধি ও ভাইরাস ছড়ানোর জন্য দায়ী। ডেঙ্গু জ্বর, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল, তা আজ দক্ষিণ চীন, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশসমূহ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে।,এবং ইউরোপে ছড়ানোর সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

এডিস মশা প্রতিরোধ—

এডিস মশা শুধু দিনের বেলায় কামড়ায়। ফলে দিনের বেলায়ই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা বৃষ্টির জল ও পরিষ্কার জল। ৪/৫ দিন জমে থাকা জল হল এডিস এর বংশ বিস্তারের স্থান, তাই মশা বংশ বিস্তার করতে না পারলে এ রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনাও কম।

কয়েকবছর এরোগের ভয়াবহতায় এডিস মশা যাতে বংশ বিস্তার করতে না পারে তাই জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা চলছে। এটি বর্ষা মৌসুমেই সাধারণত দেখা দেয়।

কার্যপ্রণালী—

যখন একটা ভাইরাস বহন ডেঙ্গু মশা একজন ব্যক্তিকে কামড়ায়, ভাইরাসটা মশার লালার সঙ্গে একসঙ্গে চামড়ার মধ্যে প্রবেশ করে। এটি রক্তের শ্বেতকণিকাতে প্রবেশ করে, কোষের ভিতর প্রজনন করে এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিষয়ে—

ডেঙ্গু মাঝেমধ্যে শরীরের বিভিন্ন অন্যান্য সিস্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে। একটি চেতনা হ্রাস মাত্রা তীব্র ক্ষেত্রে ০.৫-৬.০% হয়, যা মস্তিষ্কের ভাইরাস সংক্রমণ দ্বারা বিশেষণীয় হয় বা পরোক্ষভাবে অত্যাবশ্যক অঙ্গহানি হতে পারে। যেমন লিভার।

উল্কার সাতকাহন

লি খে ছে ন – অ নি র্বা ণ ম ন্ড ল



আমরা হয়তো অনেকেই ‘তারা খসা’ (shooting star) কথাটার সাথে পরিচিত। এই বিষয়টি সত্যিই কি আমি আজ এই লেখার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করবো। ‘তারা খসা’ (shooting star) বিষয়টির সাথে কোন তারা বা নক্ষত্রের আসলে কোন সম্পর্ক নেই। যখন মহাকাশ থেকে আগত কোন কঠিন বস্তুপিন্ড আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে তখন তাকে বলা হয় ‘মেটেওরয়েড (Meteoroid)’। এবার এই তীব্র গতিসম্পন্ন বস্তুপিন্ড বা ‘মেটেওরয়েড (Meteoroid)’ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুমন্ডলের সাথে প্রবল ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন করে

এবং জ্বলতে শুরু করে। আমাদের আকাশে বা বলা উচিৎ বায়ুন্ডলে এই যে তীব্র জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড/আলোর ঝলকানি দেখতে পাওয়া যায় একে 'মেটেওর (Meteor)' অথবা অনেক সময় 'ফায়ারবল'ও বলা হয়ে থাকে। যদি কোন 'মেটেওর (Meteor)'-এর কিছু অংশ পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের দিকে তার এই অগ্নিময় যাত্রাপথে ভাগ্যবশত বেঁচে থাকে তখন সেই ভাগ্যবান পিন্ডটিকে বলা হয় 'মেটেওরাইট (Meteorite)' বা উল্কাপিন্ড। অর্থাৎ এই তারাখসা বিষয়টি উল্কাপতন ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদিও এই উল্কাপতন একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা (Random Event)। কিন্তু উল্কাপতনের যখন কোন ঘটনা দেখতে বা শুনতে পাওয়া যায় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন উল্কাপিন্ড খুঁজে পাওয়া যায় তখন তাকে 'Falls' উল্কাপিন্ড নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর আমাদের অগোচরে থাকা কোন উল্কাপিন্ডকে যখন খুঁজে পাওয়া যায় মরুভূমির বুকে বা কোন হিমবাহের জমাট বাঁধা বরফের মধ্যে তখন তাকে 'Finds' উল্কাপিন্ড নামে আখ্যায়িত করা হয়।

যাই হোক এতো বলা হল উল্কাপতনের ঘটনা। কিন্তু এই উল্কা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এতো উৎসাহিত কেন?

মানবভ্যতার ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত যে নভোযানগুলো মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র চাঁদ ব্যতীত অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে সেভাবে কোন নমুনা

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়নি। নাসার ছয়টি অ্যাপোলো মিশনে প্রায় ৩৮০ কিলোগ্রাম শিলা ও ধূলিকণা চাঁদ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছিল। এছাড়াও, সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন 'লুনা' মিশন, চীনের 'চাঙ্গে' মিশনেও চাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। চাঁদ ব্যতীত 'স্টারডাস্ট' মিশনে ৮১পি/ওয়াইল্ড নামক ধূমকেতু, জাপানের 'হায়াবুসা' মিশনে 'ইটোকাওয়া' গ্রহাণু, 'হায়াবুসা-২' মিশনে 'রিয়্যুগু' গ্রহাণু থেকে মিলিগ্রাম পরিমাণ ধূলিকণার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সুতরাং, নমুনার অভাব বিজ্ঞানীদের আগ্রহ শতগুণ বাড়িয়ে দেয় উল্কার প্রতি। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়মেই উল্কা এসে আছড়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন গ্রহাণু, গ্রহ, উপগ্রহ থেকে।

উল্কা কোথা থেকে আসে?

এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে যেসকল উল্কাপিন্ড পাওয়া গেছে তারা মূলত মঙ্গলগ্রহ, চাঁদ ও বিভিন্ন গ্রহাণু থেকে নির্গত হয়েছে। এখানে পাঠকের প্রতি দুটি প্রশ্ন রাখছি। (১) আমরা কীভাবে জানতে পারি যে, কোন উল্কা মঙ্গল থেকে বা চাঁদ থেকে বা গ্রহাণু থেকে এসেছে? (২) শুক্র বা বুধজাত গ্রহাণু পাওয়া কি সম্ভব পৃথিবীর বুকে? আলোচনা হোক কমেন্টে।

উল্কার শ্রেণীবিন্যাস:-

উল্কার শ্রেণীবিন্যাস বিশদে উল্লিখিত।

উল্কাকে সাধারণত দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) Undifferentiated ও (২) differentiatedI Undifferentiated হল সেইসকল উল্কা যাদের কোনপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন হয়নি,সৌরমন্ডলের জন্মকাল থেকেই একই উপাদান নিয়ে এরা বিরাজমান। এদের মূল উপাদান হল 'কনড্রাইট (Chondrite)'I এরা মূলত পাথুরে প্রকৃতির হয়। আর differentiated হল বাকী সকল উল্কা যাদের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়েছে। এরা পাথুরে ও ধাতব বা লৌহজাত উভয় প্রকৃতির বা উভয়ের মিশ্রণ হতে পারে।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ভারতে যেসকল উল্কাপিন্ড পতিত হয়েছে বা খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হাতে। জিএসআই-এর কোলকাতা পার্কস্ট্রীট সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার অফিসে উল্কার একটি গ্যালারি রয়েছে।

প্যারিডোলিয়া (Pareidolia)

লিখেছেন - অশোক কুমার সাও



মেঘের মধ্যে গনেশ বা শিব কিংবা ক্রুশবিদ্ধ যিশু ইত্যাদির আদল অথবা ফল, সব্জি কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন, যেমন আরবি হরফে লেখা আল্লাহ (ﷲ) দেখিয়ে সেগুলোকে অলৌকিকতার নিদর্শন হিসেবে দাবি করা পোষ্ট ফেসবুকে মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। অথচ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে কেউ বুঝতে পারবেন এর সঙ্গে অলৌকিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি নিজেও

কখনো না কখনো মেঘের মধ্যে বা নোনা ধরা দেওয়ালে মানুষের মুখ বা কোনো পশু পাখির আদল দেখে চমৎকৃত হয়েছেন।

এই পোষ্টের ফটোগুলোতে গাছের কাণ্ডের মধ্যে গনেশ, মেঘের মধ্যে গণেশ, শিবলিঙ্গ ও ক্রুশবিদ্ধ যিশুর আদল দেখানো হয়েছে। অন্য একটি ফটোতে কাটা পেয়ারার বীজের বিন্যাসে আরবি হরফে লেখা "আল্লাহ" (ﷲ) দেখা যাচ্ছে। এগুলো নিতান্তই সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। এই ধরণের সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে থেকে অর্থপূর্ণ কোনো ইঙ্গিত খুঁজে নেওয়ার এই প্রবণতার নামই হল প্যারিডোলিয়া (Pareidolia)।



Pareidolia শব্দটি তৈরি হয়েছে para (পরিবর্তিত) এবং eidolon (আকৃতি) এই দুই গ্রীক শব্দ নিয়ে। এই

বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে সাধারণ প্রভাব হচ্ছে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত নকশার মধ্যে মানুষের মুখাবয়ব খুঁজে পাওয়া।

এই প্যারিডোলিয়া মানুষের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার সহায়ক একটি বৈশিষ্ট্য যা বিবর্তনের ধারায় মানুষ অর্জন করেছে। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে অপর মানুষের মুখাবয়ব চিনে নেয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। একটি মানব শিশু জন্মের দুই দিনের মধ্যেই মানুষের বিভিন্ন মুখভঙ্গি চিনতে ও সেগুলো অনুসরণ করতে শিখে যায়।এর ফলে সে কোনো মানুষের মুখের ভাব ও ভঙ্গী দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারে। এই বুঝতে পারার ক্ষমতা সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বসবাস করবার জন্য একটি জরুরি বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মানুষের মুখের আকৃতির সঙ্গে মিল আছে এমন কোনো বস্তু মস্তিষ্কের কর্টেক্স অঞ্চলে দ্রুত উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণেই একটি বৃত্ত, দু'টি বিন্দু ও একটি আনুভূমিক দাগকে মানুষের মুখ হিসেবে কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না।

পরবর্তী কালে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে নানা ধরনের আকৃতি সেই আকৃতি প্রসঙ্গে কিছু ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে জমা হতে থাকে। এই আকৃতিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু যেমন আছে তেমনি আছে

নানা ধরণের অক্ষর, সংখ্যা ইত্যাদির প্রতীক চিহ্ন। যে ব্যক্তি যে ধরনের চিন্তা বেশি করে, সে সেই ধরনের প্যারিডোলিয়া বেশি দেখে। যে পশুপাখি ভালোবাসে, সে মেঘের মধ্যে হাতি দেখে। যে ধার্মিক, সে গাছের কাণ্ডের বা মূলের বিচিত্র আকৃতিতে গনেশের মূর্তি দেখে।



আরবী বর্ণগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এবং আরবী ক্যালিগ্রাফী অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় বলে একই বর্ণ বিভিন্ন আকৃতিতে লেখা যায়। প্যারিডেলিয়ার কারনে কয়েকটি লাইন এবং লুপকে অনেক কিছু ভেবে নেওয়া সম্ভব। এই কারণেই ধার্মিক মানুষ অনেক সময় মেঘের মধ্যে বা কাটা পেয়ারার বীজের বিন্যাসে "আল্লাহ" (الله) লেখা

দেখতে পায়। একই কারণে দেবনাগরী "ওঁ" লেখা দেখতে পাওয়াও প্যারিডেলিয়ার উদাহরণ।

“যাদের ছোটোবেলাটা পার হয়েছে অথচ মানসিক শৈশবাবস্থা কাটেনি তারাই অলৌকিক শক্তির সমর্থক হতে পারে।”

- স্টিফেন হকিং



কেন বার বার ওঠে ঝড়

লি খে ছে ন – সৌ মি ত্র চৌ ধু রী

ঝড় যেন থামছেই না। ক্রমাগত ধেয়ে আসছে একটার পর একটা।

জন্ম ইসতক দেখছি ঝড় ঝঞ্জা তুফান। ভিন্ন নামে জানান দেয় বিধ্বংসী উপস্থিতি। টাইফুন হারিকেন সাইক্লোন। ফনী বুলবুল আইলা আম্ফান। বহু নাম ঝড়ের। দেশ ভেদে সাগর ভেদে ভিন্ন নাম।

আটলান্টিক, ক্যারিবিয়ান সাগর, মধ্য ও উত্তরপূর্ব মহাসাগরে ঝড় হ্যারিকেন। প্রশান্ত মহাসাগরে টাইফুন। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগরের ঝড়ের নাম সাইক্লোন। যে-নামই হ'ক, তার দাপটে গ্রাম শহর বন্দর নগর তছনছ।

গবাদি পশু বন্য জন্তুর মৃত্যু। হাজারে লাখে মারা পড়ে মানুষ।

'লাখ' শব্দটি অতিরঞ্জিত হল কি? বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা ১৯৯০ সালের ঝড়ের কথা মনে করুন। গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল। জলোচ্ছ্বাস ২০ ফুট উঁচু। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু।

'ভোলা' নামের সাইক্লোনের কথা ভাবলেই শিউড়ে উঠতে হয়। বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) আছড়ে পড়া ঝড় কেড়ে নিয়েছিল চার-পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রাণ। বেসরকারি মতে দশ লক্ষ।

১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বেগে আঘাত হেনেছিল ফণী (৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়)। ঘূর্ণিঝড়টি খড়্গপুরে আছড়ে পড়ে তাকে ধ্বংস করে দিয়ে হুগলির আরামবাগ হয়ে চলে যায় বাংলাদেশে।

পরের বছর (২০২০) বিধ্বংসী আইলা ঝড়ে ভারত বাংলাদেশর বড় অংশ বিধ্বস্ত। পরের বছর ভয়ানক আম্ফান। বছর না পেরোতেই ক'দিন আগে (২০২১) ঘটে গেল আরেকটি অতি ভয়ঙ্কর ঝড়, ইয়শ।

ঝড়ের পর ঝড়। শুধু ভারত-বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বঙ্গোপসাগরেই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু তটে বিভিন্ন সময় আছড়ে পড়েছিল হারিকেন। ফ্লোরেন্স, হার্ভে। হাওয়াই দ্বীপের ঝড় 'লেন'। ফিজিতে সাইক্লোন 'জোসি'। ঝড়ের সালতামামী নয়। মানুষ জানতে চাইছেন কেন ঘন ঘন এত ঝড়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের

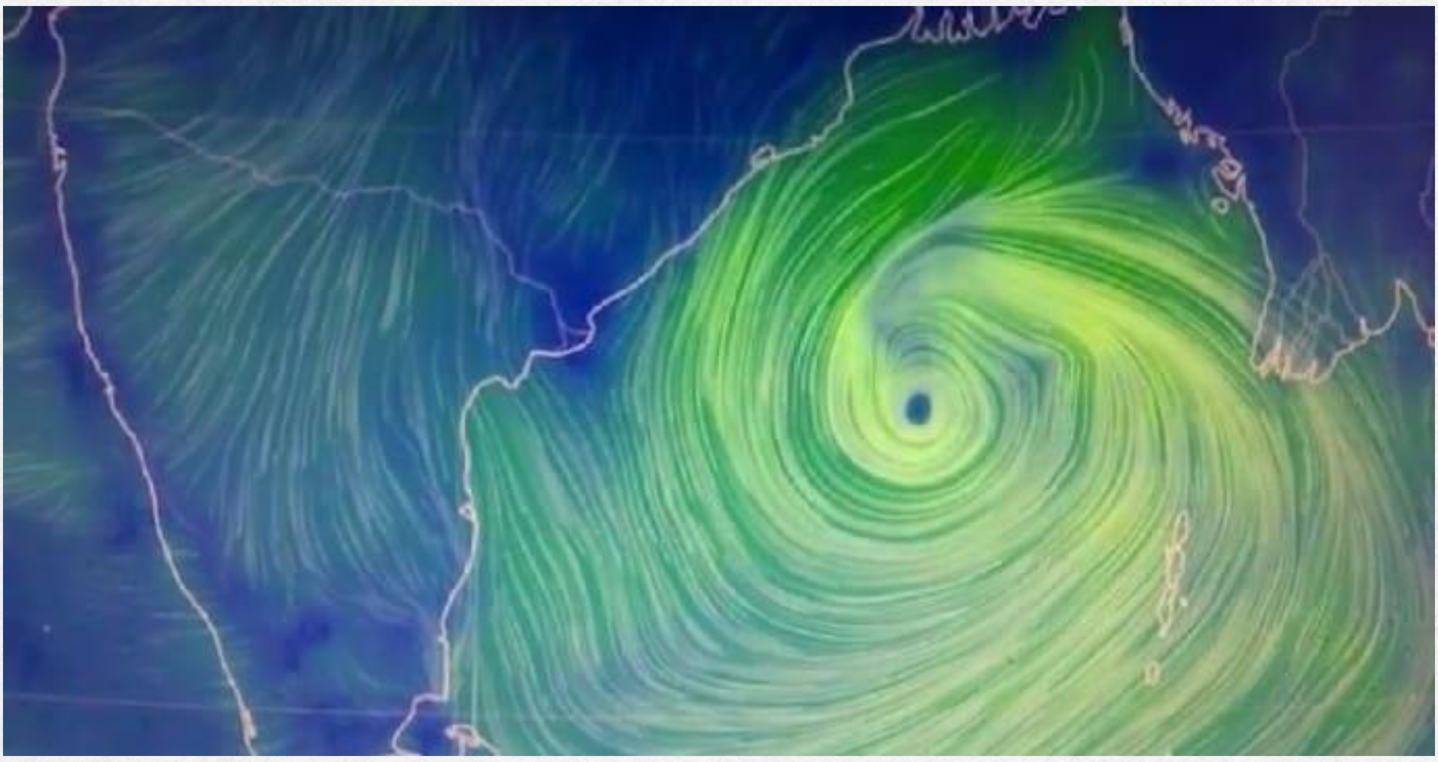
কারণে পৃথিবী গ্রহের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠে জলের বর্ধিত তাপমাত্রা ডেকে আনছে বিধ্বংসী ঝড়। সাগরে জলতলের তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রির (সেলসিয়াস) বেশি হলে সেখানে নিম্নচাপ তৈরি হয়। কারণটি সহজ বোধ্য।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠতে থাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর একটি বায়ুশূন্য অঞ্চল তৈরি হয়। শূন্যস্থান পূরণ করতে তখন পার্শ্ববর্তী এলাকার শীতল এবং ভারী বাতাস উড়ে আসে। দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসা বাতাস জন্ম দেয় ঘূর্ণিঝড়ের। এক কথায় নিম্নচাপ থেকে তৈরি হওয়া ঝড়ই হলো ঘূর্ণিঝড়। গতিবগের উপর নির্ভর করে ঝড়ের চরিত্র। ট্রপিক্যাল সাইক্লোন, সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম ইত্যাদি। ঝড়ের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব? শত্রু পক্ষের ধেয়ে আসা মারণ মিশাইল আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু সাগরের বুকে জন্ম নেওয়া নিম্নচাপ আর সৃষ্ট ঝড়? প্রতিহত করবার অস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে মজুত নেই।

ঝড় ঠেকিয়ে রাখবার একমাত্র উপায়, পৃথিবী গ্রহের উষ্ণতা কমিয়ে আনা। উষ্ণতা বৃদ্ধি হেতু পৃথিবীর জলবায়ু ভীষণই বদলে গেছে। সংশোধন করে নেওয়া অর্থাৎ গ্রহের উষ্ণতা কমিয়ে আনা এখন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সেই কাজটাই করতে হবে। নইলে ফল মারাত্মক। সম্পূর্ণ গ্রহটাই ধ্বংস

হয়ে যাবে। ক্রমাগত ধেয়ে আসা ঝড় ঝঞ্ঝা তুফান তারই অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনছে।

বিপদ মালুম হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র তাই গেল গেল রব। মানুষের মুখে কেবল পরিবেশ দূষণের ফিরিস্তি। জল, বায়ু, মাটি, বিষাক্ত। সাথে আরেকটি বিপদ। পৃথিবী গ্রহের



উষ্ণায়ন। আমাদের বাসযোগ্য ধরিত্রীর বুকে মানুষ উদ্ভিদ জলজ প্রাণী, সবার অস্তিত্বই বিপন্ন। সব মিলিয়ে পৃথিবী গ্রহ খুবই বড় অসুখে আক্রান্ত। মুল কারণ, গ্রহের উষ্ণায়ন।

‘উষ্ণায়ন’ নামেরর এত বড় বিপদ সৃষ্টি করল কে? নিঃসন্দেহে মানুষ নামের প্রজাতি। সুখ সমৃদ্ধি ভোগ্যপন্য বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় যথেচ্ছ আবর্জনা ছড়িয়েছে। ফলস্বরূপ পৃথিবী গ্রহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটাই।

কেমন করে? তাপ শক্তি নির্গত করে। আরাম আয়েশ আর ভোগ্য বস্তু উৎপাদন করতে দরকার শক্তি। শক্তি তৈরি করতে প্রয়োজন জ্বালানি। যেমন কয়লার দহনে উৎপন্ন তাপ শক্তি কাজে লাগিয়ে আমরা পাই বিদ্যুৎ শক্তি (Thermal power)। বিদ্যুৎ শক্তি বিনা জীবন অচল। রাস্তায় বিজলি বাতি, বাড়িতে ফ্রিজ, ঘর ঠাণ্ডা রাখবার এয়ার কন্ডিশন মেশিন। আধুনিকতা আর প্রগ্রতির পথে চলতে জ্বালানির দহন অপরিহার্য।

শুরু হয়ছিল শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে (1760-1820)। মানব সভ্যতার অতি দ্রুত জয়যাত্রা। কলকারখানায় চলল লোহা ও অন্য ধাতু গলানো। রেল, জাহাজ, গাড়ি তৈরি হতে লাগলো। এগুলি অগ্রগতির মানদণ্ড। সভ্যতার খিদে মেটাতে প্রয়োজন হল বিপুল শক্তি।

শক্তি বা এনার্জি এল কোথা থেকে? কাঠ, জ্বালানি তেল, কয়লা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ফুয়েল দহন করে। যত বেশী পুড়তে লাগল প্রাকৃতিক জ্বালানি, ততই বৃদ্ধি পেল বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড আর চারপাশের উষ্ণতা।

বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিণাম কি মানুষ আগে বুঝতে পারেনি? ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনে ডুবে থাকা মানুষ, প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারেনি। কিন্তু বুঝেছিলেন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়। দেড়শ বছর আগেই। সাবধানও করেছিলেন মানুষকে।

'বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে, অতএব সাবধান' এমন বানী শুনিয়েছিলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী জন টিন্ডাল (1820-1893)। আরেক জন নোবেল প্রাপ্ত (১৯০৩)

সুইডিশ বিজ্ঞানী স্যাভান্তে আরহেনিয়াস (1859-1927) সতর্ক করে বলেছিলেন, 'বাতাসে অধিক পরিমান কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে বড় বিপদ ডেকে আনবে'।

কেন এমন বললেন? কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কাজে লাগায় গাছ। বৃক্ষকুল গ্যাসটি গ্রহন করে নিজের খাদ্য বানায় (Photosynthesis), আর বাতাসে ছড়িয়ে দেয় অক্সিজেন। কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারি বৃক্ষ সম্পদ নির্বিচারে কোতল হয়েছে বিশ্বজুড়ে। অরণ্য ধ্বংস করে শহর নগরের পত্তন হয়েছে। ফলত, প্রকৃতির বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের আধিক্য বেড়েছে। এতটাই যে বায়ু মণ্ডলে এর উপস্থিতি বিপদ সীমা অতিক্রম করে ধ্বংসের দামামা বাজাচ্ছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে সংবেদনশীল মানুষজন।

ছোট্ট একটা গ্যাসের কারসাজিতে কেন গোটা নীল গ্রহটাই বিপর্যস্ত? কারণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটি নিজ গুনে এটি তাপ শোষণ করে রাখে। কেমন করে? শতাব্দী প্রাচীন বৈজ্ঞানিক খুঁজে পেয়েছিলেন উত্তর। একশ আঠান্ন বছর আগে প্রমাণ লব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন পদার্থবিদ জন টিন্ডাল।

একটা কার্বন এবং দু'টো অক্সিজেন, তিনটে মাত্র পরমানু দিয়ে তৈরি রাসায়নিক যৌগ কার্বন ডাইঅক্সাইড। গ্যাসটি তার অশেষ ক্ষমতা বলে শুষে নেয় সূর্য থেকে বিকিরিত অবলোহিত (infrared light) আলো। সূর্যের আলোয়

থাকে সাত রং। রঙের বর্ণালীতে দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘের আলোটি লাল বর্ণের। বায়ু মণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয় লাল আলো এবং তাঁর চাইতে বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ। ফল সহজেই অনুমেয়। বাতাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তাপ ঊর্ধ্বাকাশে না-গিয়ে মাটিতে ফিরে আসে (গ্রিন হাউস গ্যাস)। অবশ্য কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়াও গ্রিন হাউস গ্যাস পরিবারে অন্য সদস্যও আছে। জলীয় বাস্প, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড,ওজন। তবে ভূপৃষ্ঠে উত্তাপ ফিরিয়ে আনবার সবচাইতে বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন যৌগ কার্বন ডাইঅক্সাইড (ও জলীয় বাস্প)।

বহু প্রমাণ হাতে নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন আরহেনিয়াস। বাতাস দু'ভাবে তাপ ধরে রাখে। বাতাসের মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহিত হবার সময় (selective diffusion)। দ্বিতীয়ত তাপ শোষণের (absorption) মাধ্যমে। বাতাসের অন্য উপাদান গুলোয় (দ্বিপারমানিক নাইট্রোজেন অক্সিজেন) তাপের প্রভাবে কম্পন (vibration) ঘটে। দুই পরমানুর মধ্যেকার কম্পন। ফলে প্রচুর পরিমান তাপ শোষণ করতে পারে তারা। কিন্তু বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাস্প শোষণ প্রক্রিয়ার (absorption) মাধ্যমে তাপ গ্রহণ করে। এদের (CO2, H2O) পরমাণু গুলো কাঁপতে থাকে বর্ণালির অবলোহিত (Infrared) অঞ্চলে। কাঁপতে থাকা একটি অনু তাপ মোচন (Emission) করলে আরেকটি অনু সেটি গ্রহণ করে কাঁপতে থাকে (vibrate)। এই প্রক্রিয়ায়

অর্থাৎ তাপের শোষণ–মোচন-শোষণ (Absorption-emission-absorption), কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাস্প পৃথিবী তলে তাপ ধরে রাখে।

টিন্ডালেরর আবিষ্কারের ছত্রিশ বছর পর বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উষ্ণতা সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করলেন। কী তার গবেষণা লব্ধ তথ্য? কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কারখানা থেকে নির্গত হচ্ছে জ্বালানি দহনের ফলে। নির্গত গ্যাস সঞ্চিত হচ্ছে বায়ু মণ্ডলে। ফলে গ্রহের উষ্ণতা বেড়ে চলেছে। নিখুঁত ভাবে আরহেনিয়াস বললেন, 'কার্বন ডাইঅক্সাইডের এখন (১৮৯৬) যা পরিমাণ, ভবিষ্যতে সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে আশঙ্কাজনক মাত্রায়, ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস'। এখনকার গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যও প্রায় তেমন।

উষ্ণতা বৃদ্ধি আশঙ্কা জনক। তবুও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নস্যাৎ করে দেশ বিদেশের ক্ষমতাবান রাজনীতিক, ব্যবসায়ী মহল বিশ্ব-উষ্ণায়ন তত্ত্ব মানতে নারাজ। একাধিক ভ্রান্ত ধারনা প্রচার করে ক্রমাগত উষ্ণায়ন বিরোধী বিতর্ক সৃষ্টি করে চলেছেন। কারণ পৃথিবীর ক্রম উষ্ণায়ণ প্রক্রিয়া প্রতিহত করলে হ্রাস পাবে ভোগ্য পন্যের উৎপাদন। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসায়িক স্বার্থ।

আমরাও উষ্ণায়ন নয়, ঝড়ের ধ্বংস লিলার পর শুধু মাত্র গৃহহারা মানুষদের ত্রান বণ্টন, নদী সমুদ্রের বাঁধ নির্মাণ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। বঙ্গোপসাগরে উদ্ভুত ঘন ঘন ঘূর্ণি ঝড়

নিয়ন্ত্রনের উপায় ভাবি না। কেন বারবার ঝড় ওঠে জেনেও আমরা নির্বিকার।

ক'দিন আগেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে ধেয়ে এল 'টাউকটে', মহা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। প্রবল বেগে (১৫৫ থেকে ১৬৫ কিলোমিটার) ধেয়ে এসে গুজরাত মহারাষ্ট্রে বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল। 'টাউকটে'র উৎপত্তি স্থল আরব সাগর। সেই ঝড়ের রেশ মিটতে না মিটতেই, বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে এল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, 'ইয়াস'। আরবি শব্দ ভাণ্ডারে যার অর্থ হতাশা। ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতির সাথে তুলনা চলতে পারে 'আমফান' ঝড়ের। বিধ্বংসী আমফানে বহু মানুষ এক বছর পরেও গৃহ হারা। ভারতবর্ষ দেশটি ঘনঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিশেষজ্ঞদের (কোপেনহেগেনের ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশন্স) অভিমত, দেশটি জলবায়ু বহু বৈচিত্র্যে ভরপুর। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ অনেকগুলো ঋতু এখানে। 'জলবায়ু' অনেক গুলো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বায়ুমণ্ডল, জলভাগ, জমে থাকা বরফ, ভূত্বক, প্রাণী, উদ্ভিদ। এছাড়াও অন্য বহু বিষয়ের সাথে (ভৌগলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতির) জড়িয়ে আছে এর সম্পর্ক।

কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতকে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় দুই ভাবে বিভক্ত করেছে। দেশটিতে ক্রান্তীয় বর্ষা ও উপক্রান্তীয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রবল প্রতাপ। দেশের কোন অঞ্চলে যখন খরা, অন্য অঞ্চলে বন্যা। কোথাও তাপপ্রবাহ, অন্য কোথাও আবার শৈত্য প্রবাহ।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় আয়লা, সিডার, আমফানের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন দেশবাসী। ঝড়-ঝঞ্ঝার তীব্রতা আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে গড় তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি হয় মে মাসে। ফলে শুকনো ও গরম হাওয়া পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ যত কম, তার উত্তাপ তত বেশি। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ভারতে সামগ্রিকভাবেই গ্রীষ্মের উষ্ণতা ও বর্ষার গতি প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ক্রমাগত ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘটেই চলেছে দেশে। অন্য কোথায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের মারাত্মক প্রভাব দেখা যাচ্ছে দেশের সর্বত্র।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব প্রথমে দেখা যায় সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলে। সুন্দরবন সহ উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, হাওড়ায়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবন অঞ্চল। ঘনীভূত নিম্নচাপ সৃষ্টি করে ঘূর্ণিঝড়। তার প্রবল হওয়ায় ফুঁসে ওঠে সমুদ্র। শুরু হয় জলোচ্ছ্বাস। জলোচ্ছ্বাসে নদী সাগরের বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে লোকালয়ে। চাষের জমিতে। ভেসে যায় ধান, পান, ঘর, জীবন।

সমুদ্র লাগোয়া নদী গুলোর জলস্তর বৃদ্ধি প্রতি বছরই ঘটছে। গত পঁচিশ বছরে (১৯৯৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত) সমুদ্রের জলের উচ্চতা বেড়েছে ২.৯৬ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেন্টিমিটার। একুশ শতকের মধ্যে ৬০ সেন্টিমিটার বা ২

ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে (ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর প্রতিবেদন)। তখনকার সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবন সহ বহু শহর দ্বীপ সম্পূর্ণই ডুবে যাবে।



অনেক সুন্দরবন-গবেষক মনে করেন, মাটির বাঁধ নয়। সুন্দরবন বাঁচাতে দড়কার কংক্রিটের শক্ত চওড়া বাঁধ। মাটির বাঁধ হলে ভিত করতে হবে ৮০ থেকে ১০০ ফুট আর উপরের অংশ খুবই চওড়া (১৪ থেকে ২২ ফুট)। সঙ্গে দরকার কড়া নজরদারি।

সমুদ্রবাঁধ ও বাদাবনের উপর নির্ভর করে সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলের অস্তিত্ব। সমুদ্রের জলে জোয়ার-ভাটা, জলতল বৃদ্ধি, ঢেউয়ের উচ্চতা ইত্যাদি বাড়তেই থাকবে। ঘটতে থাকবে বাৎসরিক ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন। সমুদ্র তটে আছড়ে পড়বে উঁচু ঢেউ। বাঁধ টপকে সাগর জল প্রবেশ করলে বের হতে পারবে না। সব মিলিয়ে বিষয়টি বড়ই উদ্বেগের। বিপন্ন হয়ে উঠবে মানুষের জীবন জীবিকা, গ্রাম শহরের অস্তিত্ব।

সব মিলিয়ে বড়ই বিপন্ন মানুষ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বিশ্ব উষ্ণায়নকে রোখার জন্য দরকার আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা; দীর্ঘমেয়েদি পরিকল্পনা। দিন যত এগোবে, ততই ঘন ঘন ঘটতে থাকবে বিপর্যয়। বিশ্বকে পরবর্তী প্রজন্মের বাসযোগ্য করে তুলতে হলে উষ্ণায়ন কমাতেই হবে। বিশ্বব্যাপী কিছু কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। তবে কোন রকম আশার কথা এখনও শোনা যাচ্ছে না।

প্রতিবেদনে সংকট উত্তরনের পথ দেখানোও বাঞ্ছনীয়। তাই বলতে হয়, গাছ লাগান। বিদ্যুৎ জল অপচয় করবেন না। পেট্রোল গাড়ির পরিবর্তে ব্যাটারি চালিত যান ব্যবহার করুন।

সাবধান না হলে আগামী একশ বছরে পৃথিবী গ্রহের ধ্বংস অনিবার্য।

পরিচিতিঃ ড. সৌমিত্র কুমার চৌধুরী, এমেরিটাস মেডিক্যাল স্যায়েন্টিস্ট ও বিজ্ঞানী (প্রাক্তন), চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা, ৫ম তল; ৩৬ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬।

E-mail: soumitrag10@gmail.com.

ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান

লিখেছেন - ধীরাজ দন্ডপাট



১ম পর্ব:

ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান শুরু হয়, গুপ্তযুগে। হিন্দুধর্মকে শাশ্বত ও সনাতন বলে ঘোষিত হয়। ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের ব্রহ্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিলনা। যদিও উপনিষদে 'ব্রহ্ম'বিশ্বচেতনার নির্বিশেষ রূপ হিসেবে বর্ণিত আছে। পুরাণ ও রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় এই সময়। ব্রাহ্মণগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে এগুলি লিপিবদ্ধ করার সময় প্রচুর অলৌকিক ও অপ্রাকৃত ঘটনার সংযোজন বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নামে চালিয়ে দেন। উদাহরণ স্বরূপ, বেদব্যাসের মহাভারতে

শ্লোক সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার, গুপ্তযুগে লিপিবদ্ধ মহাভারতে শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ।

পণ্ডিতদের মতে এই গুপ্তযুগেই পুরাণগুলিও লিপিবদ্ধ করার সময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণরাই ভারতের সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রের যথেচ্ছ বিকৃতি সাধন করেন।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য এই যে, অত্যন্ত কুরুচিকর ভাবে চিরশত্রু বৃহস্পতির চরিত্র হনন করে একটি দীর্ঘজীবী শব্দ বন্ধও প্রচলিত করেন।তাচ্ছিল্যতার কারনে এইজন্য হীনবুদ্ধির কোন ব্যক্তিকে 'বুদ্ধির বৃহস্পতি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

২য় পর্ব:

উত্তর ও দক্ষিণভারতের বেদাশ্রিত আচার সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি কিছুটা আলাদা ছিল বলে মনে করা হয়। ধনে মানে বনিক সম্প্রদায়ও ছিল তৎকালীন ব্রাহ্মণদের প্রায় সমান। ওদন্তপুরীরাজের সাথে বারংবার যুদ্ধে বিদ্ধস্ত বল্লাল সেন বনিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রচুর অর্থসাহায্য দাবি করেন। বনিক সম্প্রদায় অস্বীকার করায়, শাসন ব্যবস্থায় অসহযোগিতার কারনে বহু বনিককে কৌলীণ্য হারাতে হয়। এমনকি ওই বনিক শ্রেণীকে শিক্ষা দীক্ষা ও সান্নিধ্য দেওয়ার কারনে, বহু ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে অধঃপতিত হতে হয়। সুবর্ণবনিকদের পৈতেধারণ নিষিদ্ধ

হলো। বনিক শ্রেণী প্রতিশোধ স্পৃহায়, অর্থের দৌলতে নিম্নদাস ও ভৃত্যশ্রেণীকে হাত করতে আরম্ভ করে। বল্লাল অনোন্যপায় হয়ে কৈবর্ত্য, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদিদের সৎ শূদ্রের পর্যায়ে উন্নিত করেন এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের শুদ্ধিযজ্ঞের বিধান দিলেন। ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণত্ব ঘুচে গেল। তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হলেন।

কোন কোন পণ্ডিত মহলের মতে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে জড়িত আদিশুরই নাকি প্রথম বাংলায় ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন। তার আগে ব্রাহ্মণ ও ছিলনা, বেদ চর্চাও ছিল না।

৩য় পর্ব:

বাঙালী সমাজে পদবীর ইতিহাস চর্চায় যে আবহ তৈরী হয়েছে, কৌলীন্য প্রথার কুয়াশা অপসারণের জন্য সে রকম আগ্রহ মোটেই ছিল না। বাঙালী কুলীন ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কুলগৌরব কাহিনী ছত্রিশ জাতের বঙ্গভূমীতে আজও অপ্রতিহত। একসময় ব্রাহ্মণদের কুলভঙ্গের অপরাধে অনেককেই সমাজে পতিত হতে হতো। কুলীনদের কুলই ছিল সর্বস্ব। সেই কুলগৌরবে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একাধিক বিবাহ করে কুলীন কন্যা পিতার কুল রক্ষা করতেন।

বঙ্গভূমীর অধিকাংশ জনপদই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, বাঙালী সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থার ছকে বাঁধা পড়ে।

পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তার লাভ করে। কৌশলে স্থানীয় অব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জমি নিয়ে মন্দির নির্মান করে দেব দেবীর পূজা শুরু করে, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনাকে আশ্রয় করে

ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংরক্ষণী মনোভাব বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার শীর্ষস্থানে যে ব্রাহ্মণরাই থাকবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারন সমাজ রক্ষকরাই সমাজের ভক্ষক হন। নানা গোত্র প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখার ব্রাহ্মণরা যে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতক থেকেই উত্তর ভারত থেকে বাংলায় এসেছেন, একথা বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন।

৪র্থ পর্ব:

কুলশাস্ত্র কাহিনীর কেন্দ্রে আছেন আদিশুর। আদিশুর সম্ভবত কোলাঞ্চ-কনৌজ বা কাশী থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। এই সঙ্গে কৌলীন্য প্রথার ইতিহাসও জড়িত। কৌলীন্য প্রথার বিবর্তনের সাথে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের নাম ও জড়িত। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সাথে জড়িত আদিশুরের পৌত্র ক্ষিতিশুর ও তৎপুত্র ধরাশুরের নামও। বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলকাহিনীর বর্মনরাজ শ্যামল বর্মন ও হরি বর্মনের নাম জড়িত। কুলজী গ্রন্থমালার ঐতিহাসিক ভিত্তি

নিয়ে যদিও পণ্ডিতগণ দ্বিধাবিভক্ত। এই ভ্রান্ত ধারণা অদ্ভূত এক প্রভাব বিস্তার করে আছে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, তাহল আদিশুরই নাকি প্রথম বাংলায় ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন। আদিশুর কাহিনী এবং কৌলীন্য প্রথার সাথে ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগও জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম থেকে; যে গ্রামে যে ব্রাহ্মণ বাস করতেন, সেই গ্রামের সাথে উপাধ্যায় বা আচার্য্য যুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের পদবীগুলো সৃস্টি। যেমন, গঙ্গ, বন্দ, ভট্ট, চট্ট, মুখো ইত্যাদি।

৫ম পর্ব:

অধুণা বাংলায় যে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া পেলে বর্ণহিন্দু বিধবা বা ছুঁৎমার্গী বর্ণগর্বিত মানুষ নিজেকে অশুচী জ্ঞান করেন, সেই ছত্রিশ জাতের মধ্যে কারা পড়েন? এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে এই সমাজে রক্তে অস্থি মজ্জায় মিশে আছে ছত্রিশ জাত। সে সব অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্ব, তথ্য প্রকাশ পেলে, বর্ণহিন্দুদের জাত্যাভিমানে যথেষ্ট আঘাত লাগার সম্ভাবনা থেকে যায়। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণ ছাড়া ছত্রিশটি জাতকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১) উত্তম সঙ্কর বিভাগ।

২) মধ্যম সঙ্কর বিভাগ।

৩) অধম সঙ্কর বিভাগ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কিন্তু এই তিন বিভাগ ছাড়াও চতুর্থ বিভাগে আরও পাঁচটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যবসায়িক কাজের কারনে প্রথম বিভাগটি জলচল ছিল, দ্বিতীয় বিভাগটি সম্ভবত জলাচল ছিল।এখন সহজেই অনুমেয় যে, স্বর্ণ বণিক ও তৈলকার মধ্যম সঙ্কর, গন্ধ বণিক উত্তম সঙ্কর। ব্যবসার কর্মগত বর্ণবিভাগের ফলে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন জনের বর্ণ মিশে থাকাই স্বাভাবিক। এই কারনে পুরাণ বা স্মৃতিশাস্ত্রে বারংবার বর্ণসঙ্কর ও জাতিসঙ্করের কথা উচ্চারিত হয়েছে। ব্রাহ্মণকে এই সঙ্কর জাতি হিসেবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারন এই সব পুরান ও স্মৃতিশাস্ত্র গুলো প্রায়শই তাদেরই রচনা। নরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মনরা যে পরিমান সঙ্কর বিভাগে,

,অধিকাংশ বর্ণই প্রায় সম বৈশিষ্ট্যের সঙ্কর।

তৎকালীন সমাজপতিগণ উচ্চ সঙ্কর জাতি ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। বিত্তশালী না হয়েও এই উচ্চবর্ণ বিত্তশালীদের অনুগ্রহ লাভ করেছেন।ফল স্বরূপ তাঁদের অন্যায় অপরাধ গুলোচাপা পড়ে গেছে জাতগর্বের কারনে।

মনুর মতে যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী অধিকারী হতে পারবেন।সবর্ণা স্ত্রী না থাকলে ক্ষত্রিয়জাত স্ত্রী সে অধিকার পেতে পারতেন। কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্রজাত স্ত্রী সে অধিকার পেতেন না। এমনকি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাত স্ত্রীর

গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলে তা অনৈতিক হিসেবে গন্য হতোনা। স্বল্প প্রায়শ্চিত্য করে সে দোষ খণ্ডন করা যায়। সে কালে কামলোলুপ জমিদাররাও ব্রাহ্মণদের সাথে একজোট হয়ে স্পর্শ্ব দোষের বিধান দিতেন।

৬ষ্ঠ পর্ব:

একই রক্ত, একই গড়ন, তবে কেন ওরা ব্রাহ্মণ?

গবেষণা লব্ধ বহু তত্ত্ব, তথ্যের একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়, বাঙালি উচ্চ নীচ জাতের মধ্যে শরীরের রঙ,কেশ, চক্ষু,ও গড়নে এমনকি রক্তেও কোন পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কুল গরিমা উচ্চবর্ণের আত্মরতির সম্মোহন ছাড়া কিছু নয়। নরতত্ত্বের দিক থেকে চারি বর্ণের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। জাত বিভাজনের আর্থিক ও সামাজিক ধর্ম কর্মের অধিকারই এমন প্রভেদ সৃস্টি করার কারন।

ভবদেব ভট্টের রচনা থেকে জানা যায়, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ত্ব প্রমানে ব্রাহ্মণ শ্রেণী কিভাবে প্রকৌশলে চতুরতার সহিত খাদ্যাখাদ্যে ও আচার বিচারে কিরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। নট, নর্ত্তক, ধোপা, কর্মকার, কাপালিক, কৈবর্ত্ত, ভীল, চণ্ডাল, শুঁড়ি, স্বর্ণকার ইত্যাদি এমনকি নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবি ব্রাহ্মণদের রন্ধনকৃত ও স্পর্শ্বিত খাদ্য গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো।শূদ্রের পাককৃত ও স্পর্শ্বকৃত খাদ্য গ্রহণে ব্রাহ্মণদের পূর্ণ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত

করার বিধান ছিল। ক্ষত্রিয়ের দ্বারা পাককৃত ও স্পর্শ্বিত খাদ্য গ্রহণে অর্দ্ধ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করলেও চলত। বৈশ্বদের পাককৃত ও স্পর্শ্বিত খাদ্য গ্রহণে তিন চতুর্থাংশ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করেও ব্রাহ্মণদের দোষ মুক্তি ঘটত। অপর দিকে শূদ্রদের পাককৃত ও স্পর্শ্বিত খাদ্য যদি ক্ষত্রিয় গ্রহণ করে, তাহলে তাদের পূর্ণ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। কিন্তু বৈশ্বদের পাককৃত বা স্পর্শ্বিত খাদ্য গ্রহণে অর্দ্ধ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করলেও চলত। অন্যদিকে শূদ্রের দ্বারা পাক করা সুস্বাদু খাদ্য বিপদকালে ব্রাহ্মনদের গ্রহনে বাধা ছিল না। সে ক্ষেত্রে শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই দোষ খণ্ডন হয়ে যেত।

ব্রাহ্মনদের এইসব চাতুর্য্যে ভরা নির্দেশাবলীতে প্রমান হয়, কোথাও লঘু পাপে গুরুদণ্ড, আবার কোথাও বা গুরু পাপে লঘু দণ্ডের বিধান ছিল। এসব দেখে আজও সমাজ জাত বিচারে ছোট বড় খোঁজে। সম যোগ্যতা বিশিষ্ট তফশিলি জাতি বা উপজাতির পুত্র বা কণ্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রবল ভাবে নাসিকা কুঞ্চন চলে।

৭ম পর্ব:

বর্ণাশ্রম প্রথা:

আনুমানিক চার হাজার বছর আগে, ভোল্গাতট, মতান্তরে জার্মানি বা পোল্যাণ্ডের দিক থেকে আর্যরা তৎকালীন ভারতে এসেছিল। তবে শিকার বা খাদ্যসঙ্কটে পড়ে যে আগমন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্থানীয় অনার্যদের

সাথে শুরু হয় লড়াই। পরাজিত অনার্যরা নিহত হন কেউবা অন্যত্র পালিয়ে বাঁচেন। নারীরা লুণ্ঠিত হন।

অনার্য নারীদের সাথে অত্যাধিক মিলনের ফলে পরবর্তী কালে জাতিগত বিশুদ্ধতা হারানোর ভয়ে আর্য নেতৃত্ব কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করেন। ভারতীয় সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার সূচনা। অতিরিক্ত সম্পদ ও সুখ ভোগের জন্য অনার্যদের দিয়ে যুদ্ধ, পাহারাদার, কৃষিকাজ, পশুপালন নির্মান, আবর্জনা পরিস্কার ইত্যাদি দৈহিক শ্রমের কাজ করানো হতো। কালক্রমে ভারতীয় জনসমাজ আর্য-অনার্য-মোঙ্গোল-দ্রাবিড়-শক-হুন-যবন-পাঠান-ও অন্যান্য জন গোষ্ঠীর বর্ণ সঙ্কর এক উন্নত জনজাতিতে পরিনত হয়। সম্পদের ভোগ দখল একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হানাহানির কারন, তেমনই শ্রেণী বিভাজন ও রীতিনীতি কঠোর করে ব্রাহ্মণ কুলের জন্ম হয়।সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য প্রয়োজন পড়ে সুলভ শ্রমের, জোরদার করা হয় দাস ও বর্ণব্যবস্থাকে। নারীর স্থান হয় অন্তপুরে,রাজা আর ব্রাহ্মণদের অঙ্কে। ব্রাহ্মণ্যবাদকে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা করতে আনুমানিক তিন হাজার বছর পূর্বে রচিত হয় শ্রুতি সঙ্কলন বেদ। বিশ্বভাবনার সঙ্কলন ঋকবেদ, ঋকমন্ত্র গীত আকারে সামবেদ। যজ্ঞের মন্ত্র সঙ্কলিত যজুর্বেদ, চিকিৎসা শাস্ত্র শত্রুদমন এবং সৃস্টি রহস্যের মন্ত্র সঙ্কলিত অথর্ববেদ।

দখলকৃত ভূভাগ সম্পদ ও শ্রম সেবাকে কায়েম রাখতে রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উদ্ভব। সমস্ত সম্পদের অধিকারী হলেন রাজা। নীতি রক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী, যারা ক্ষত্রিয়। রাজার পরের ক্ষমতাধারীরা হলেন এই ব্রাহ্মণ শ্রেণী। কৃষিজীবী, ব্যবসায়ীরা হলেন বৈশ্য। আর অনার্য ও পরাজিত শত্রুরা হলেন শূদ্র। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের রমণে অনার্য নারীর গর্ভে সৃস্টি বর্ণসঙ্করের।

বৈদিক যুগের শেষ পর্বে আসে মহাকাব্যের যুগ, অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারতের যুগ। রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। বেদান্তের অন্যতম ধারা দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। বৈদিক ভাববাদকে আশ্রয় করে পুনর্জন্মবাদের জন্ম দেন শঙ্করাচার্য্য। অন্যদিকে বাস্তববাদী কপিল ও সযুগ্যা রৈক্যা, সৃস্টি হয় সর্বাপেক্ষা অবৈদিক, জনপ্রিয় বস্তুবাদী ধারা চার্বাকের লোকায়ত সংহিতা। অন্য দুটি সম সাময়িক ধারা হলো জৈনীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন ছিল বাস্তববাদী এবং বেদ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বর বিরোধী ভারতীয় দর্শন তন্ত্রের ধারা যা বহু সাধকের সম্মিলিত চিন্তার ফসল। প্রমাদ গুনলেন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা, রাশ আলগা হওয়ার ভয়ে চার্বাকীয় লোকায়ত ধারাকে অবদমিত করার চেষ্টা চালান হলো। জাতিভেদ বর্ণবৈষম্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিধান সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষ ও নৈরাশ্যের জন্ম দিয়েছিল। চলল বেদ বিরোধী বস্তুবাদী চর্চা। বৈচিত্র এল লোকায়ত দর্শনে। পুরোনো

কাশ্যপ, অজিত কেশকম্বলি, পাকুধা কাত্যায়ণ, সঞ্জয় বেলাতিপুত্ত, মাখালি গোশালা, নিগন্থ নাথপুত্ত প্রমুখদের ভাবনায় ও সক্রিয়তায়।

৮ম পর্ব:

মনুষ্যকুলে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর দেবকুলে দেবরাজ ইন্দ্র, এদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যখনই মুনি ঋষিরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে মহর্ষি বা ব্রহ্মর্ষি হওয়ার চেষ্টা করেছেন,নিজের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে উর্বশীদের পাঠিয়ে তপস্যা বা যজ্ঞ ভণ্ডুল করার চেষ্টা চালানে হয়েছে। রামায়ণে দেখতে পাই শূদ্র শম্বুক দেবলোক জয়ের অভিপ্রায়ে দেবত্ব লাভের জন্য তপস্যার কারনে রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ সমাজ নির্দেশিত ন্যায় নীতি ও শিষ্টাচার কি দেখতে পাই? রামের বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতম আচরণ। এটা কি প্রাচীনতম বর্বর সংঘাত নয়? বর্ণ প্রাধাণ্য নিরঙ্কুশ করার ঘৃণ্যতম প্রচেষ্টা নয় কি? অব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে নির্মূল করার কৌশল নয় কি? এ বিষয়ে পুরাণ ও মহাকাব্য গুলোতে ছড়িয়ে আছে ভুরি ভুরি উদাহরণ। জাতপাতের ব্যাধিতে আক্রান্ত ভারতীয় সমাজে গরু ছাগলের মত হরিজন নিধন চলেছে। হাতের কাজ ও কায়িক শ্রমকে চিরদিন হেয় করা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্বভাব ও লক্ষণ।

নীতি ও ধর্মানুশাসনের ব্যপারে ব্রাহ্মণদের এত হেল দোল ছিল না। কিন্তু নীচু শ্রেণীর মানুষরা অমান্য করলে অপরাধ বলে গন্য হত। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের এক উৎকট আত্মম্ভরিতা ছিল। উপবীতকে অস্ত্র করে জীবনে প্রতিষ্ঠা এবং অন্ধ সংস্কারের অচলায়তনে বাস করার প্রবনতা ছিল প্রকট। ধর্ম সম্পর্কে নানারকম পরষ্পর বিরোধী শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে ধর্মের উৎপত্তির বিষয় জানা যায়। আচার থেকে ধর্মের উৎপত্তি। আচার সর্বস্ব ধর্মের থেকে সৃষ্টি হয় নানা বাছবিচার স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিধি নিষেধ। ধর্মের হাত ধরে এল আচার সর্বস্ব কুসংস্কার।

পূর্ব ভারত ছিল দার্শনিকদের জন্মক্ষেত্র। এই এলাকার মানুষ চিরদিন যুক্তি, বুদ্ধিকে হৃদয় ও আবেগের উপর স্থান দিয়েছে। আসলে বাঙালি চিরদিন যুক্তিবাদ ও বুদ্ধির উপাসক। বাসুদেব, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি যুক্তির উপাসকরা তার মধ্যে অন্যতম।

৯ম পর্ব:

ভারতীয় সমাজে শাস্ত্রীয় বিধানই মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে রক্তের মধ্যে জাগিয়েছে ঘৃণার মারাত্মক জীবানু, যা আজ এ সমাজে প্রাণঘাতী ব্যাধির ন্যায় আতঙ্কের। লড়াইটা তাই মানুষের সপক্ষে অমানবিকতার বিরুদ্ধে। অথচ পুরাকালে এ দেশেই

নাকি তেমন সমাজ ছিল যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল না। জীবন ধারনের জন্য অন্নের অধিকার সমান ভাবে স্বীকৃত ছিল। ভাগবতেই আছে তার প্রমান। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অন্নলাভ দেহী মাত্রেই অধিকার। তার বেশী আত্মসাৎ করা দণ্ডনীয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় সাধারণ মানুষের অধিকার সম্বন্ধে যে দেশের ধর্মগ্রন্থে এমন উদার মত প্রকাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধানগুলো মানুষ সম্বন্ধে অমানবিক কেন? সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধা গুলোকে কৌশলে অপ্রকাশিত রেখেছেন। কারন সাধারণ মানুষ যদি ব্রাহ্মণের সমান রসদের ভাগীদার হন, তাহলে কুলগর্ব নির্মূল হয়ে যাবে, নীচকুল ব্রাহ্মণদের আজ্ঞাবহ থাকবেন।বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গম' রবি ঠাকুরের 'অনধিকার প্রবেশ' এসব তথ্যের জলন্ত উদাহরণ। বেদেই বোধ হয় সর্বপ্রথম, সমাজে অস্পৃশ্যতার, ভেদাভেদের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। গীতাতে আছে গুন ও কর্ম অনুসারে বর্ণভেদের কথা। অথর্ব বেদে কর্মে বা বৃত্তিতে কোন উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিলনা। শক্তিশালী দাসদের অনার্য হিসেবে দেখা হতো। মনুস্মৃতিতে দাস প্রথার উল্লেখ আছে।সমস্ত শূদ্র ছিল ব্রাহ্মণদের দাস। এদের আবার বেশ কয়েকটা ভাগ ছিল, যেমন বংশ পরম্পরায় দাস, উপঢৌকনে প্রাপ্ত দাস, দাসীর গর্ভজাত দাস, অন্নের জন্য স্বেচ্ছায় বরণ করা দাস,

যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের থেকে প্রাপ্ত দাস ইত্যাদি। যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করতোনা তাদেরকে দস্যু নামে অভিহিত করা হতো।

যজ্ঞস্থলে শূদ্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন ঘৃণ্য কাজকে শূদ্রচিত কাজ বলে বর্ননা করা হতো। কোন কোন যজ্ঞে শূদ্র ও সারমেয়দের দিকে তাকানো একই অপরাধ বলে গন্য করা হতো। শূদ্রের বেদপাঠের অনুমতি ছিলনা, এমনকি শূদ্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের বেদপাঠও নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণকে আঘাত করতো, তাহলে তার সেই অঙ্গ কেটে দেওয়া হতো। কিন্তু অনুরূপে ব্রাহ্মণের একই কাজে কোন শাস্তির বিধান ছিল না।

১০ম পর্ব:

মনু সংহিতায় পুরুষকে বীজ এবং নারীকে ক্ষেত্র হিসেবে বর্ননা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা সব বর্ণের নারীর সাথে যথেচ্ছ ভাবে সহবাস করে পুত্র উৎপাদন করতে পারবে। সব বর্ণের নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্রেরা সমান অধিকার পেতেন না। ব্রাহ্মণ পুরুষের সব বর্ণের নারীর কাম চরিতার্থ করার অধিকার থাকলেও, শূদ্রের সে অধিকার ছিলনা। শূদ্রেরা সম জাতীয় ব্যতীত অন্য কোন নারীতে সম্ভোগ করার বিধান ছিলনা। শূদ্রের ঔরসজাত সমস্ত পুত্রের সামনাধিকার ছিল।

পুত্র উৎপাদনকে যতই ধর্মীয় রূপ দেওয়া হোক না কেন, বহুবর্ণা নারীতে যৌন সম্ভোগ ও যৌন অপরাধ কে শাস্ত্র সম্মত করাও ব্রাহ্মণদের অসংযমী যৌন জীবনের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

নারী যাতে ব্যভিচারিনী না হয়, তার জন্য নানা বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে মনুসংহিতায়। কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষ সম্মন্ধে কোন নির্দেশ নেই। কোন প্রেম ভালোবাসার বালাই নেই, আছে শুধু ক্ষেত্রস্বরূপা নারীতে কাম চরিতার্থ করার বাসনা। নারী শুধু মাত্র পুরুষের কাম চরিতার্থ করা আর পুত্র উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ (পুত্রী বা কন্যার উল্লেখ দেখা যায়না)। নারীর নিজের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য দেওয়া নেই।

পুরুষের প্রয়োজনে যৌন ব্যভিচারকে ধরে রাখার জন্য প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে গণিকাবৃত্তিকে। এই বৃত্তি সেই প্রচীন কাল থেকেই অনুমোদিত।অথচ সেই পতিতাদের সমাজের বাহিরে ঠেলে পাঁচিল তোলা হয়েছে কার স্বার্থে? এটা অবশ্যই সমাজপতিদের শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষিত রাখার কৌশলি প্রচেষ্টা।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী 'পতিব্রতা' হলো একপতি। পতি ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি আসক্তি থাকলে 'কুলটা', তিন পুরুষের প্রতি আসক্ত হলে 'বৃষলী'। চার পর পুরুষের প্রতি আসক্তা হলে 'বেশ্যা', সাত পর পুরুষের প্রতি

আসক্তা হলে 'যুঙ্গী'। তার বেশি পুরুষের প্রতি আসক্তি থাকলে 'মহাবেশ্যা'।

পক্ষান্তরে পুরুষের ক্ষেত্রে তেমন কোন নিদান নেই। পুরুষ শত নারীতে আসক্ত হলেও সৎ(যদি সতীর পুংলিঙ্গ সৎ হয়)।

মহাভারতে গণিকার অন্নগ্রহণ, গণিকা সংসর্গকে পাপ বলা হয়েছে। এমনকি যমের দক্ষিণ দুয়ারের দিকে বা নগরের দক্ষিণ প্রান্তে গণিকালয় নির্মানের নিদান আছে।

অনুগল্প:

সরস্বতী পূজা

লি খে ছে ন – জা মা ল আ ন সা রী



স্কুলে সরস্বতী পূজা। মহা সমরোহের সাথে প্রতি বছর পূজা উদযাপন হয়। এই বছরও হচ্ছে। সেই উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। সকাল আটটা বাজতে না বাজতে স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্র ছাত্রীদের ভিড় জমে উঠেছে। ছাত্র ছাত্রীরা একে একে সরস্বতী পূজার অঞ্জলির দিয়ে, নিজ নিজ কাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ দেবীর নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বেরিয়ে আসছে।

আকাশ স্কুলে গেছে ঠিকই কিন্তু অঞ্জলি দেয়নি। বাড়ি ফেরার পথে ওর বন্ধু ধর্মদাস জিজ্ঞেস করে, “কি রে আকাশ, তুই মা সরস্বতী কে অঞ্জলি দিলি না কেন?”

আকাশের বাবা নাস্তিক। ধর্ম কর্মে মন নেই। সেই মন ও মানসিকতা আকাশের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছে। আকাশ তার বন্ধুকে প্রশ্নের জবাবে জানাই, "না,আমি অঞ্জলি দিইনি। তুই-ই বল দেখি,অঞ্জলি দেব কেন ?"

ধর্মদাসের এ কথা শুনে একটু রাগ হল। তবুও সাধারণ ভাবেই বলে, শুন, পূজার সময় অঞ্জলি না দিলে বিদ্যার দেবী সরস্বতী রুষ্ট হবেন। আর দেবী রুষ্ট হলে আমাদের লেখাপড়া ভালো হবে না। আমাদের যাতে পড়াশুনায় মনযোগ বাড়ে, আমরা যাতে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাই...সেই জন্যই তো অঞ্জলি দিতে হয়।

—ও আচ্ছা, এই জন্য অঞ্জলি দিস। শুন ধর্মদাস, আজ তোকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা জানিয়ে দিই। এই সত্য কথা আমি বাবার মোটা মোটা বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে জেনেছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি জীবনে কোনও দিন অঞ্জলি দিয়েছিল! বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা কি কোনও দিন অঞ্জলি দিয়েছিল! না| জীবনে কোনও দিন অঞ্জলি দেয়নি। তবুও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা, বুদ্ধি অর্জন করে বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিল। মেঘনাদ সাহা অঞ্জলি না দিয়েও ভারতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পেরেছিল। শুন, অঞ্জলি, তঞ্জলি কিছুই নয়। চাই পড়াশোনার প্রতি অদম্য ইচ্ছা তবেই তুই পরীক্ষায় ভালো ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবি। যদি তুই

পড়াশোনা না করিস, তাহলে কি ঐ অঞ্জলি দিয়েই পরীক্ষায় পাস হতে পারবি ?

ধর্মদাস তার বন্ধু প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। চুপচাপ বাড়ির পথে হাঁটতে থাকে।.

"ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে মূলত ভয়ের উপর, রহস্যময়ের ভয়, পরাজয়ের ভয়, মৃত্যুর ভয়। ভয় নিষ্ঠুরতার উৎস। কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে নিষ্ঠুরতা আর ধর্ম হাত ধরাধরি করে চলছে। ধর্মকে আমি ভয় থেকে উৎসারিত একটি ব্যাধি আর মানবজাতির অবর্ণনীয় দুঃখ - দুর্দশার উৎস বলে মনে করি।"

- বার্ট্রান্ড রাসেল (নোবেলবিজয়ী বিখ্যাত দার্শনিক)

কবিতা:

ধর্মের চাকা ঘুরছে আজও

- অ শো ক দা স চা র্বা ক



খুব অতীতে 'হিন্দু' বলে
ছিলনা কেউ আগে,
সবাই তখন ' মানুষ ' ছিল
আদিম সেসব যুগে।

সব মানুষের জন্ম একই
লুসি* মাতার পেটে,

জানতোনা তাই কি কার ধরম
প্রাচীন পৃথিবীতে।

লুসির রক্ত সবার শিরায়
বইছে পরম্পরা,
তাহার সাথীর বীর্যে সৃজন
মানব দেহের ধারা।

ছিলোনা তাই জাতের বিভেদ
সেই ভায়েদের মাঝে,
জড়িয়ে ধরতো পরস্পরে
নাচে গানে কাজে।

মানবধর্ম ছিল শুধু
সবার সাদা মনে,
ছিলোনা তাই দেবদেবীরা
ধরার কোন কোনে।

সত্যি স্বর্গ ছিল সেথায়
নয়কো সে দেশ মায়া,
নরকভয়ে কাঁপতোনা কেউ
কল্পে যমের কায়া।

কালে কালে ঠগবাজেরা

দেবের জন্ম দিলো,
স্বর্গলাভের লোভ দেখিয়ে
ধর্ম সৃজন হলো।

সেই সময়ে জন্ম নিল
চতুর পুরুত যত,
ধরা জুড়ে এলো তখন
ধর্ম শত শত।

হিন্দু হলো, জৈন হলো
হলো খিরিস্তান,
শাস্ত্র গুজব ফেঁদে হলো
সৃষ্টি ভগবান।

মানবধরম হারিয়ে গেল
কপট ধর্ম এলো,
বিলোপ হলো মানবজাতি
ধর্ম হলো কালো।

জিজ্ঞাসিলে কেউ বলিল
"হিন্দু আমি", কেউবা "মুসলমান"
বললোনা কেউ "মানুষ আমি -
পঞ্চভূতের প্রাণ"।

এক ধর্মী উঠলো বলে
তার ভগবান সেরা,
অন্য সাধু বলে "ওটার
মাথাটা কর ন্যাড়া,

পরের ধর্ম ভয়াবহ
ওদের করো আড়ি,
আপন ধর্ম রাখতে ওদের
মাথায় মার বাড়ি।"

কেউবা আবার বলে দেখি
সেজে বামুন কায়া,
"অব্রাহ্মণ নিচু জাতি
ছুঁইনা ওদের ছায়া।"

সরল মানুষ ধর্মমোহে
ভায়ের গলা কাটে,
সেই সুযোগে শাসক পুরুত
ব্যবসা করে হাটে।

সেই ট্রেডিশন চলছে আজও
ভিন ধর্মী মরে,
শাসক পুরুত রক্ত চোষে
ধর্মের কল ঘোরে।

" *Religion was invented when the first con man met the first fool"*

- *Mark Twain*

(ধর্মের আবিষ্কার হয়েছিল যখন প্রথম ঠগবাজ প্রথম বোকা
মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলো)

অশোকদাস চার্বাক, হনলুলু, আমেরিকা ৭/১৭/১৮

* এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব চেয়ে প্রাচীন সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর পূর্বের মানবীর ফসিল - বর্তমান পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের আদি ঠাকুমা - সূত্র "LUCY OF ETHIOPIA" Google

মানুষ হও

স জ ল কা ন্তি টি কা দা র



আমাকে তোমরা হিন্দু বোলোনা

বোলোনা মুসলমান

বোলোনা আমায় বৌদ্ধ জৈন

বোলো না গো খ্রীষ্টান।

তোমরা শুধু আমাকে একটু

মানুষ নামেতে ডেকো

তাতেই আমি বেশী খুশী হবো
এটুকু মনেতে রেখো।
ধার্মিক হতে চাই না বন্ধু---
মানুষ হতেই চাই।
“সবার উপড়ে মানুষ সত্য
তাহার উপড়ে নাই।”
এই কথাটি জেনেও আমরা
তবু যে বিভেদ করি
ধর্ম জাতি আর বর্ণ নিয়েই
হিংসা প্রাচীর গড়ি।

ভগবানকে আমরা দেখিনি কখনো
কোথায় থাকেন তিনি?
মানুষকে কিন্তু দেখেছি বন্ধু
মানুষকেই আমি চিনি।
মন্দির মসজিদে ওড়ে যে টাকা
গীর্জা ভরে শুধু উপহারে
এদিকে দেখি পথের শিশু
পচে মরে অনাহারে!

ধর্মের নামে রক্তের খেলা
মানুষ যে পায় ভয়
আমরা আজও মানুষ হইনি
এতে অবাক হতেই হয়!

তাইতো বন্ধু এসব দেখেই
বড্ড খারাপ লাগে
ধার্মিক যদি হতে চাও তুমি
মানুষ হওগো আগে।

নিয়ম

প্র দী প চ ক্র ব র্তী



আকাশের সূর্য -তারা
এক নিয়মেই চলে,
ছন্দোবদ্ধ জীবন যাপন
যুক্তির কথাই বলে।

মহাকাশের দুনিয়াতে
নেই ভাগ্যের হাত,
নিয়ম মেনেই দিন কেটে যায়
কেটে যায় কত রাত।

পৃথিবীর হোমো সাপিয়েন্স
বানায় যত নিয়ম,
ধর্ম নিয়ে নৃত্য করে
দেখায় কত-ই ভড়ং।

আমার ধর্ম

সু ম ন বি শ্বা স



জীব, জড়েতে ধর্ম আছে; ধর্ম বিহীন কিচ্ছু নাই,
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানে— হিংসা, বিভেদ, বিবাদ চাই।
মানুষ বানায় উঁচু, নীচু; জাত ভেদাভেদ রয় যে তাই,
গোনার বেলায় দলে আছে; বাস্তবে অচ্ছুত পাই।

স্বজনপ্রীতি কাকে বলে, ধর্ম দেখে যায় শেখা,

সবাই সমান নাই সেখানে; গ্রন্থে এমন পাই লেখা।
লোভ আর ভয়ে কাজ করে সব, পরকালের চিন্তাতে,
মূলে ভবে ধন গড়ে যায়; মানুষ পথে হাত পাতে।

ধর্মঢালে গুষ্টিসুদ্ধ, লুটেপুটে খায় ঢপে,
সকল মন্দকাজে থাকে; ফের সারাদিন নাম জপে।
এইপারে না ওইপারে সুখ; এই বলে বয়ান ব্যাচে,
ভণ্ডের হয় বিলাস জীবন; বোকা নাচে তার প্যাঁচে।

ভিক্ষে দিয়ে পুণ্যি কেনে; ছবি শোয়ায় রাজখাটে,
প্রাসাদসম 'স্রষ্টার ঘর'; পরজীবী সেই হাটে।
পরের ভাতে বেগুন দিয়ে, খায় চিরকাল পালজুটে,
তবু আসন বজ্জাতে পায়; শ্রমজীবী হয় মুটে।

অভিশাপ আর আশির্বাদের ভাণ্ড মেলে ধর্মতে,
দ্বিচারী হয় ধর্মধারী; তফাৎ কথায়, কর্মতে।
আমার ধর্ম কৃত্রিম নয়; কোত্থাও তার নাই ফাঁকি,
আমার ঈশ্বর শৃঙ্খলে নাই; যখন-তখন তাই ডাকি।

সুমন বিশ্বাস, হিদিয়া (৯২১০), অভয়নগর, যশোর।



নভেম্বর বিপ্লব – জন রীড-এর চোখে

লিখেছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ – রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

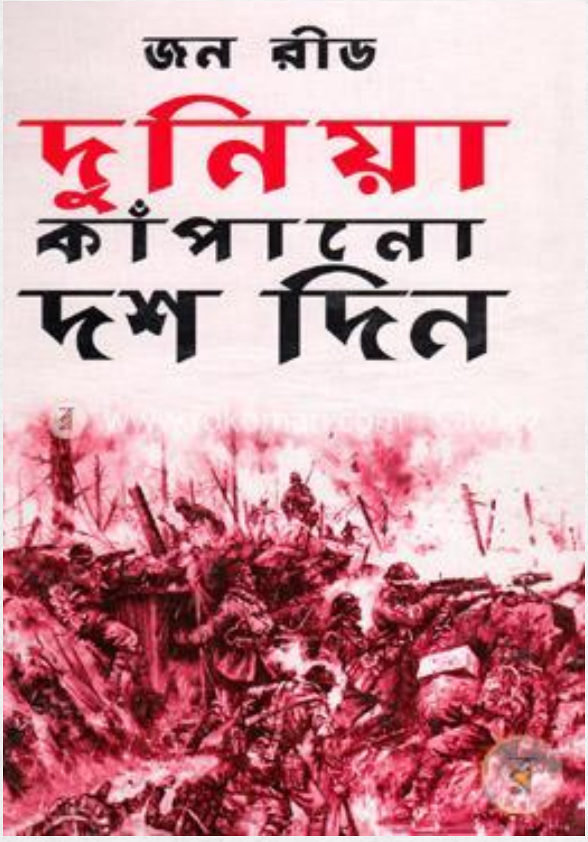
সেপ্টেম্বর ১৯১৭। ফিনল্যান্ড-এ আত্মগোপন করে থাকার সময়ে লেনিন একটি বই লিখতে শুরু করেছিলেন। তার নাম রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ছটি পরিচ্ছেদ লেখা শেষ হয়েছিল। সপ্তম পরিচ্ছেদ লেখা সবে শুরু হয়েছে এমন সময়ে, লেনিন বলছেন,

> “ ‘ব্যাঘাত’ ঘটাল রাজনৈতিক সংকট, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্ন। এমন ‘ব্যাঘাতে’ কেবল আনন্দই হবার কথা। তবে পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশটা (‘১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা’ নিয়ে) হয়ত দীর্ঘকাল স্থগিত রাখতে হবে। লেখার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভ করাই বেশি প্রীতিকর ও হিতকর।” (পেত্রগ্রাদ, ৩০ নভেম্বর ১৯১৭)

যে-অভিজ্ঞতা লেনিন অর্জন করেছিলেন সেটি প্রত্যক্ষভাবে এক বিপ্লবীর। কিন্তু বিপ্লব নিয়ে লিখে চলেছিলেন এক তরুণ মার্কিন সাংবাদিক, জন রীড (১৮৮৭-১৯২০)। তারই পরিণামে ১৯১৯-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরল তাঁর বই, দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন। তার মুখবন্ধ (ইনট্রোডাকশন) লিখে দিলেন নিকোলাই লেনিন (ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ)। আর পাতারও কম জায়গায় লেনিন বইটির সুখ্যাতি করলেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারণে। বিপ্লবের প্রথম দশ দিনের রোমাঞ্চকর সব ঘটনার বিবরণ বইটিতে পাওয়া যাবে—সুখ্যাতি সেই কারণে নয়; প্রলেতারীয় বিপ্লব আর প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বলতে ঠিক কী বোঝায়—এই সমস্যাই বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের মূল সমস্যা। রীড-এর বইটি পড়লে এই দুটি ব্যাপারে পাঠকের ধারণা পরিষ্কার হবে—এই কারণেই লেনিন সুপারিশ করেছিলেন বইটি কোটি কোটি কপি ছাপা হোক আর সব ভাষায় তর্জমা হোক।

সুখের কথা, আরও অনেক ভাষার মতো বাঙলাতেও রীড-এর বইটির তর্জমা হয়েছে, যদিও অনেক দেরিতে। প্রথম বাংলা সংস্করণ বেরিয়েছিল মস্কো থেকে, ১৯৬৭-তে। ঘটো বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে আরও অনেক কারণে স্মরণীয়। ১৯৭০-এ তার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরয়, ১৯৭৭-এ তৃতীয় আর ১৯৮৭-তে চতুর্থ (সম্ভবত শেষ) সংস্করণ।

সবচেয়ে বড় কথা বইটির শেষে প্রকাশকের উপসংহার ও আলবার্ট উইলিয়মস-এর লেখা জন রীড এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মস্কো সংস্করণটিকে পাঠকদের পক্ষে আরও উপযোগী করেছিল।



দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন-এর ভূমিকায় (নিউ ইয়র্ক, ১ জানুয়ারি ১৯১৯) রীড লিখেছিলেন –

“বইটি হল ঘনীভূত ইতিহাসের একটা অনুচ্ছেদ, — সে ইতিহাসকে আমি যেটুকু দেখেছি।... পর পর কয়েকটি বই আমি লিখছি, তার প্রথম পুস্তক হিসেবে এই বইটিতে আমি শুধু নিজের দেখা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কিংবা প্রমাণসিদ্ধ তথ্যের বিবরণে সীমাবদ্ধ থাকব।”

ভূমিকাটি শেষ হয়েছিল এই বলে –

> “এ সংগ্রামে আমার মনোভাব নিরপেক্ষ ছিল না। কিন্তু মহান এই দিনগুলোর কাহিনী বলার সময়ে আমি সত্যকথনে আগ্রহী। একজন বিবেকবান রিপোর্টারের চোখ দিয়েই ঘটনাগুলোকে দেখার চেষ্টা করেছি।”

রীড-এর বইটি বেরনোর পর রুশ বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে বহু ভাষায় বহু বই লেখা হয়েছে। মহাফেজখানার নথি, পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলির খবরের কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে – বিপ্লব কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বিপ্লব যে সত্যিই কোনো ভোজসভা নয়; বাধ্য হয়েই এমন অনেক কিছু করতে হয় যেগুলি কারুরই কাম্য নয়। রীড-এর বই-এ তারও কিছু নমুনা আছে। প্রতিবিপ্লবী শক্তি কীভাবে ও কত উপায়ে বিপ্লবকে বান্‌চাল করার উদ্যোগ নিয়েছিল তার বিশদ বিবরণ আছে ভিক্টর সার্জ (১৮৯০-১৯৪৭)-এর ফরাসিতে লেখা রুশ বিপ্লবের প্রথম বছর (১৯৩০) বইটিতে। এমন কোনো কু-মতলব, ফিকিরফন্দি আর চোরাগোপ্তা পদ্ধতি নেই, যা প্রতিবিপ্লবীরা কাজে লাগায়নি।

রাশিয়ার মাটিতে লাল ঝান্ডা প্রথম তুলেছিলেন এক তরুণ ছাত্র, গিওর্গি প্লেখানভ। উপলক্ষ্য ছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এ শ্রমিকদের প্রথম সমাজবাদী বিক্ষোভ মিছিল (৬ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। তখনও রাশিয়ার কোনো সমাজবাদী-গণতান্ত্রিক

সংগঠন ছিল না। প্লেখানভ-ই প্রবাসে মার্কসীয় প্রবণতার প্রথম রুশ বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন (সুইট্‌সারল্যান্ড ১৮৮৩)। সেই প্লেখানভ, যাঁর লেখা পড়ে এক প্রজন্মর রুশ তরুণ মার্কসবাদ শিখেছিলেন, পরে মেনশেভিকদের নেতা হন, বিশ বছরেরও বেশি বলশেভিকদের সঙ্গে তাদের উত্তর চলে। অক্টোবর ১৯১৭-র তিনি রাশিয়াতেই ছিলেন, তবে অসুস্থ, শয্যাশায়ী। জাক সাদুল-কে ১৭ অক্টোবর তিনি বলেন, 'এই পোকাটাকে [অর্থাৎ বলশেভিকদের] শুধু বশে আনলেই হবে না, টিপে মারতে হবে, রক্তে ডুবিয়ে দিতে হবে। রাশিয়ার নিরাপত্তার ঐ হলো কিস্মত।' মাকসিম গর্কি-র নবজীবন পত্রিকায় ডাক দেওয়া হলো – "বলশেভিকদের মানতে অস্বীকার করুক নাগরিকরা, সক্রিয়ভাবে অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করুক, অন্তর্ঘাত ও খাবার সরবরাহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করুক। তাঁদের রাশিয়ার নাগরিকদের মূল মন্ত্র হলো – বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, সব পদ্ধতিই ভালো" (সার্জ, ইয়ার ওয়ান অফ রাশিয়ান রেডলিউশন, শিকাগো – হোল্‌ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইনস্টন, ১৯৭২, পৃ. ৯২-এ উদ্ধৃত)।

কোন্‌টি ক্রিয়া আর কোন্‌টি প্রতিক্রিয়া তা না বুঝলে রুশ বিপ্লবের আসল চেহারা ধরা যাবে না। গোটা রাশিয়া নয়। পেত্রগান ও তার আশেপাশের ঘটনা নিয়ে রীড-এর প্রাণবন্ত বিবরণ নভেম্বর বিপ্লব-এর ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে প্রবেশকের কাজ করবে। দশটি মাত্র দিনের ঘটনাবলি যেন

ইতিহাসের নির্যাস। কত বাধা (ভেতরের ও বাইরের), কত চক্রান্ত, কত বেইমানি পেরিয়ে বিপ্লব সফল হয়েছিল—এই বইটির মধ্যেই তার যথাযথ ছবি ধরা আছে। আর সেই কারণেই এ বই-এর মর্যাদা কখনও কমবে না।

এখন বাজারে মূল বইটির একটি সংস্করণ সহজেই পাওয়া যায়। সেটি বার করেছে পেঙ্গুইন বুক্স্। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এ জে পি টেলর-এর ভূমিকা সমেত এটি বেরিয়েছিল ১৯৭৭-এ; এখনও সেই সংস্করণটিই কিনতে পাওয়া যায়। ভূমিকায় অধ্যাপক টেলর-ও কিছু কিছু তথ্যগত ভুলের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গুটিয়ে প্রতিটি ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে টীকা দেন নি। অবশ্য সম্পাদনা ও ভূমিকা রচনার যুগ্ম দায়িত্ব তাঁর ছিল না। সুতরাং এদিক থেকে মস্কো সংস্করণের সম্পাদক অনেক ক'টি টীকা দিয়ে একই সঙ্গে সংশোধন ও ব্যাখ্যার কাজে সাহায্য করেছেন।

অন্যদিকে, বইটির পরিশিষ্টয় (রীড-এর দেওয়া) শেষ অংশটিতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষে একটি টাকা পেঙ্গুইন সংস্করণে পাওয়া যায় (পৃ ৩৫১ টা-৭১), মাস্কার ১৯৭৭ ও ১৯৮৭-র বাংলা ও ইংরিজি সংস্করণে সেটি গরহাজির।

মতাদর্শর দিক দিয়ে টেলর সায়েব অবশ্য অন্য মেরুর লোক। রুশ বিপ্লব, লেনিন, মার্কসবাদ ইত্যাদি কোনো বিষয়েই তাঁর মনোভাব অনুকূল ছিল না। জন রীত-এর

কৃতিত্ব সম্পর্কেও তার মন্তব্য বেশ গোলমেলে। একবার তিনি বলেন রীড-এর রচনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ – যা তিনি দেখেছিলেন ও তার অভিজ্ঞতায় এসেছিল। পরমুহূর্তেই তিনি বলেন – বইটির অনেকখানিই কিন্তু হোটেলের ঘরে শান্তিতে বসে দ্য ম্যাসেস পত্রিকার জন্যে টাইপরাইটারে লেখা (পৃ. আট-নয়)। নানা লোকের কথার টুকরো আর কী-ঘটে-থাকতে-পারে তার কল্পনা মিশিয়ে লেখা হয়েছিল দুনিয়া কাপানো দশ দিন। যেটি নাকি আবার টেলর-এর মতে 'বহুকাল ধরেই একটি রাজনৈতিক ক্লাসিক' (পৃ. সাত)। অথচ রীড-এর বইটি পড়লে দেখা যায় – তিনি চরকির মতো ঘুরছেন এখান থেকে ওখানে; বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তর তিনি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

এখানেই না-থেমে টেলর আরও বলেছেন – ১৯২৭-এ বিপ্লবের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রবাদপ্রসিদ্ধ রুশ চলচ্চিত্র-পরিচালক, সের্গেই আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮)-কে একটি ফিল্‌ম্ তুলতে বলা হয়েছিল। সেটির নাম তিনিই দিয়েছিলেন দুনিয়া কাপানো দশ দিন। টেলর-এর মতে, পুরো চিত্রনাট্যর জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল রীড-এর বইটি; সমকালীন কোনো নিউজ রিল বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হেঁটে ফিল্‌ম্‌টি তোলা হয় নি। রীড-এর বইটিকেই তর্জমা করা হয়েছিল চলচ্চিত্রর নিরিখে। তার অনেকটাই কল্পকথা (ফিকশন), রীড-এর বই-এর অনেকটাও সেই রকমই (পৃ. নয়)। মন্তব্যটি রীড ও

আইজেনস্টাইন দুজনের পক্ষেই মানহানিকর। উল্টে বলা যায়, অক্টোবর চলচ্চিত্রে এমন অনেক কিছু ছিল যা রীড-এর বই-এ নেই। চলচ্চিত্রর রুপ নাম শুধু অক্টোবর, পরে নতুন সম্পাদনা করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রর বাইরে ছবিটি মুক্তি পায় দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন নামে| ১০৪ মিনিটের এই নির্বাক ছবিটি প্রথম দেখানো হয় ২০ জানুয়ারি ১৯২৮-এ। ফিল্ম্টি একা আইজেনস্টাইন করেন নি, যুগ্ম চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন গ্রিগোরিও আলেক্সান্দ্রোভ। অনেক পরে ফিল্ম্টির (১৯৬৬) সঙ্গীত যোগ করেন দিমিত্রি শস্তাকোভিচ। যেমন, ‘দেবতাদের’ নিয়ে একটি চিত্র পরম্পরা (সিকুয়েন্স)। মার্কিন দেশে বেশির ভাগ প্রিন্ট-এ এটি বাদ দেওয়া থাকে (ফিল্ম্ ফর্ম্ - এসেজ ইন ফিল্ম্ থিওরি, নিউ ইয়র্ক – মেরিডিআন বুকস, ১৯৫৭, পৃ. ৮২)। মন্তাজ-এর পাশাপাশি টাইপেজ-এর কৌশলটিও আইজেনস্টাইন-কে থিয়েটর থেকে চলচ্চিত্রে আনতে উদ্বুদ্ধ করেছিল (ফিলম ফরম, পৃ. ৮-৯)। এই চলচ্চিত্রেই তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সাহিত্য থেকে নেওয়া আভ্যন্তর এককোক্তি (ইনার মনোলোগ)। সাহিত্যর চেয়ে তার পরিসর অনেক বড়। জেমস জয়েস-এর সঙ্গে আইজেনস্টাইন-এর একবার দেখা হয়েছিল পারী-তে। প্রায় সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও জয়েস চেয়েছিলেন। পটেমকিন আর অক্টোবর দেখতে (ঐ, পৃ. ১০৪)।

এসব রীড-এর বই থেকে আসে নি। রুশ বিপ্লবের স্বরূপ তুলে ধরার জন্যেই এমন সব উদ্ভাবন করতে হয়েছিল আইজেনস্টাইনকে। সমান্তরাল মন্তাজ-এর ফ্রেম-কে বিস্তৃত করে এসেছিল একটি নতুন গুণ যাওয়া হচ্ছিল এক নতুন এলাকায় – উত্তরণ ঘটছিল ক্রিয়া (অ্যাকশন)-র জগৎ থেকে তাৎপর্য-র জগৎ-এ; হয়তো এগুলির মধ্যে ভুলও ছিল, কিন্তু তার জন্যে আইজেনস্টাইন-এর মহত্ত্বে কোনো দাগ পড়ে না (ফিল্ম্ ফর্ম্, পৃ. ৫৮ দ্র.)। আসলে, রীড-এর বই আর আইজেনস্টাইন-এর চলচ্চিত্র দুটি আলাদা শিল্পকর্ম। সাময়িক সরকার-এর পতনেই চলচ্চিত্রটি শেষ হয়; রীড-এর বই কিন্তু ২৯ নভেম্বর অবধি ঘটনার বিবরণ দিয়ে চলে।



সাত রিল-এর এই চলচ্চিত্রটি প্রায় পুরোটাই তোলা হয়েছিল লেনিনগ্রাদ-এ। গ্রানাডা টেলিভিশন-এ রীড-এর বইটির আর-একটি চলচ্চিত্র রূপ দেন অরসন ওয়েল্‌স্

(১৯৬৭)। ১৯৮২-তে লাল ঘন্টা (বিকল্প নাম – দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন) বলে আর একটি ফিল্‌ম্‌ তুলেছিলেন সের্গেই বন্‌দারচুক, তারও ভিত্তি ছিল রীড-এর বইটি।

এমন সব মন্তব্য কীভাবে নেওয়া উচিত – ব্যাজ (নিন্দে) নাকি স্তুতি? টেলর-এর ভূমিকায় ডানহাতে রীড-কে যে-স্তুতি উপহার দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতে সেটি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। অথচ লেনিন ও ক্রুপস্কায়া দুজনেই কিন্তু রীড-এর সত্যনিষ্ঠারই প্রশংসা করেছেন। কেতাবি ঐতিহাসিকের চেয়ে এই দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর অভিমতই বোধহয় বেশি গ্রহণযোগ্য।

রীড-এর বইটিকে ‘অনেকটাই গপ্পো’ বলে নস্যাৎ করার পরেও টেলর তাঁর ভূমিকার শেষে লেখেন—লেনিন ও ক্রুপস্কায়ার একই সুরে—যে বলশেভিক বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বইটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী (পৃ. উনিশ)! এমন প্রশংসার কারণ একটাই – স্তালিন-এর আমলে রীড-এর বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু ত্রৎস্কি তার নায়ক। টেলর-এর মতে, স্তালিন-এর মৃত্যুর পর থেকে বইটি কমিউনিস্টরা দায়সারাভাবে সয়ে আসছেন, তার বেশি কিছু নয়। টেলর একথা লিখছেন ১৯৭৭-এ, অথচ তার দশ বছর আগেই, নভেম্বর বিপ্লব-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাঙলা সমেত একাধিক ভাষায় রীড-এর বইটির অনুবাদ হয়ে গেছে প্রগতি প্রকাশন, মস্কো থেকেই। এখনও পর্যন্ত

বইটির তর্জমা হয়েছে পৃথিবীর বহু ভাষায় (ঠিক কটি তা বলার মতো তথ্য হাতে নেই)। ব্যাবসার কথা মাথায় রেখেই পেঙ্গুইন বুক্‌স্‌ থেকে ১৯৬৬-তে বইটির একটি সংস্করণ বেরয়। তখনও তার কপিরাইট ছিল লরেন্‌স্‌ অ্যান্ড উইশার্ট-এর। টেলর-এর ভূমিকার নানা মন্তব্য সম্পর্কে তারা আপত্তি তোলে। পেঙ্গুইন বুক্‌স্‌ তখন কোনো ভূমিকা ছাড়াই বইটি বার করে দেয়—এমনই মুনাফার গরজ। কপিরাইট-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ট্রেলর-এর ভূমিকা সমেত আবার বেরয় পেঙ্গুইন ক্লাসিক্‌স্‌ থেকে।

রীড শুধু প্রথম সারির কবিই (মার্কিন কূটনীতিবিদ্‌ ও ঐতিহাসিক অর্থ কেনান-এর ভাষায়) ছিলেন না। টেলর নিজেও বলেছেন – রীড প্রথম সারির গদ্যশিল্পীও বটে (পৃ. আট)। এইটুকু বলাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। রীড-এর ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, সূক্ষ্ম রসবোধ আর আপাত অসার ঘটনাবলির ভেতর থেকে সারবস্তুটি বার করে আনার ক্ষমতা। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক –

> “কার্লাইল তাঁর ‘ফরাসী বিপ্লব’ পুস্তকে বলেছেন যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতায় বিশ্বে ফরাসীদের জুড়ি নেই। রাশিয়া কিন্তু এ রীতিটি অভ্যাস করে নিয়েছিল ... রাশিয়ার শীতকালে পেত্রগ্রাদের তুহিন শাদা জমাট রাস্তার ওপর সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্বল্পবসন মানুষ!” (পৃ. ৪৪)

এই দুরবস্থা সত্ত্বেও রীড লক্ষ্য করেন –

> "থিয়েটারগুলো অবশ্য চলছিল প্রতি রাত্রেই, রবিবারও বাদ যেত না। মারিনস্কি থিয়েটারে নতুন একটি ব্যালেতে নামলেন কার্সাভিনা, নৃত্যামোদী গোটা রাশিয়া ছুটল তাঁকে দেখতে। শালিয়াপিন গান গাইছিলেন। আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটারে আলেক্সেই তলস্তয়ের 'করাল ইভানের মৃত্যু' নাটক নতুন করে শুরু হয়েছে মেইয়েরহোলদের প্রযোজনায়। (পৃ. ৪৫)"

এই যে খুঁটিনাটির ওপর নজর, কোন্ ঘটনার পাল্টা হিসেবে কোন্ ঘটনা বেছে নিতে হয় এ ব্যাপারে রীড-এর কৃতিত্ব বারেবারেই ধরা পড়ে। আর বিপরীতভাবের ঘটনার সঙ্গে রীড জুড়ে দেন অন্য একটি ঘটনা –

> "মনে আছে এ অভিনয়ে বাদশাহী পেজ কোর-এর একটি ছাত্রকে দেখেছিলাম, পরনে তার ড্রেস ইউনিফোর্ম, প্রতিটি অঙ্কের শেষে সে কেতামাফিক উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল বাদশাহী বক্স আসনটির উদ্দেশে, যদিও সে আসন তখন শূন্য, তার ঈগল প্রতীকগুলিও সব নিশ্চিহ্ন ... (পৃ. ৪৫। ব্যাঁকা হরফ যোগ করা হয়েছে।)"

শেষের এই বাক্যাংশটি নিছক একটি ঘটনা থাকে না; হয়ে ওঠে প্রতীক।

উইলিয়ম ওয়ার্নিং-এর কথা উদ্ধৃত করে রীড লিখেছেন –

> "রুশ শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই লিখতে পড়তে জানে। বহু বছর ধরে দেশটা এমনই এক বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে

দিয়ে যায় যে রুশ মজুরেরা শুধু তাদের নিজেদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নেতৃত্বই লাভ করে নি, সমান বিপ্লবী শিক্ষিত শ্রেণীর বৃহৎ একটা অংশ রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক নব-জাগৃতির ধ্যান ধারণা নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দিকে ফেরে ... (পৃ. ১৬)”

কথাটি যে রুশ সৈনিকদের ক্ষেত্রেও সত্যি তা বোঝা যায় একটি রণক্ষেত্রর ঘটনায়। রীড লিখছেন –

“রিগার পেছনে দ্বাদশ আর্মির ফ্রন্টে গিয়েছিলাম আমরা, মরীয়া সব ট্রেঞ্চের কাদার মধ্যে হাড় খোঁচা খালিপা লোকগুলোর দুর্দশার একশেষ। কিন্তু আমাদের দেখেই লাফিয়ে উঠল তারা। শিটিয়ে আসা মুখ, ছেঁড়া পোশাকের তল থেকে নীল হয়ে উঠেছে গায়ের মাংস, উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে – পড়বার কিছু এনেছ? ”(পৃ. ৪৮)

নভেম্বর বিপ্লব যে অনিবার্য ছিল, হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার এটি নয়, তার প্রস্তুতিও ছিল যথেষ্ট—তারও প্রমাণ ব্রীড দিয়েছেন –

“অন্যদিকে ছিল প্রলেতারিয়েতের—মজুর, সাধারণ সৈন্য পরিব কৃষকদের নিরাকার অভিপ্রায়। বহু স্থানীয় সোভিয়েতেই ইতিমধ্যে বলশেভিক হয়ে উঠেছিল; তাছাড়া ছিল শিল্প শ্রমিকদের সংগঠন...এই কয়মাস ধরে বিপ্লবী আগুনের ওপরতলায় যে গাদ আস্তে আস্তে

শক্ত হয়ে উঠছিল তা ফেটে পড়ল ফুঁসে ওঠা অন্তর্বিদ্রোহের তরঙ্গে। সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস বসা সম্ভব ছিল কেবল এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের জোয়ারেই... ” (পৃ. ৬২)

‘স্বতঃস্ফূর্ত’ শব্দটি ঠিকমতো বুঝতে হবে। গণ-আন্দোলনে জোয়ার এল এক মুহূর্তে, কিন্তু তার প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। রীড জানিয়েছেন – ‘দিনের পর দিন বলশেভিক বক্তারা ব্যারাকে ব্যারাকে কারখানায় কারখানায় “গৃহযুদ্ধের এই সরকারকে” ধিক্কার দিয়ে অভিযান চালাল’ (পৃ. ৬২)। এমনই এক সভায় কাদা ভেঙে গিয়ে বলশেভিক নেতা লুনাচারস্কি-র বক্তৃতা শুনেছিলেন রীড – ‘পাতলা চেহারা, ছাত্রের মতো দেখতে, মুখখানা শিল্পীর মতো সংবেদনশীল। বলছিলেন কেন ক্ষমতা নিতে হবে সোভিয়েতকে।’ (পৃ. ৬৩)

শুধু মুখের কথা নয়, ছাপা কাগজও হয়ে উঠল বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রধান এক হাতিয়ার –

“হঠাৎ প্রসারিত হয়ে উঠল বলশেভিক সংবাদপত্র। ‘রাবোচি পুত’ এবং ‘সলদাৎ’ (সৈনিক) এই দুটি পার্টি পত্রিকা ছাড়াও কৃষকদের জন্য নতুন একটি কাগজ ‘দেরেভেনস্কায়া বেদ্‌নোতা’ (গাঁয়ের গরিব) দৈনিক

> প্রকাশিত হতে থাকল ৫,০০,০০০ সংখ্যায়, এবং ১৭ই অক্টোবর বেরুল ‘রাবোচি ই সলদাৎ’।” (পৃ. ৬৩)

যাঁরা মনে করেন রুশ বিপ্লব নেহাতই অল্প লোকের চক্রান্তে ক্ষমতা দখল, দয়া করে তাঁরা পত্রিকার প্রচার সংখ্যাটি নজর করবেন।

‘পেশাদার’ ঐতিহাসিকরা কদাচিৎ এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ করেন।

এবার রীড-এর রসবোধের দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

> “সামরিক ও সামুদ্রিক ব্যাপারের জনকমিশাররা চলেছেন বিপ্লবী ফ্রন্ট পরিদর্শন করতে, কে জানে সেটা কোথায়। আমরা কি সঙ্গে যেতে পারি? নিশ্চয় নয়। গাড়িখানায় লোক ধরে শুধু পাঁচ জন, দুজন কমিশার, দুজন আর্দালী এবং ড্রাইভার। তাহলেও আমার এক পরিচিত রুশী তার নাম দেওয়া যাক ত্রুসিশকা, বিনা বাক্যে গিয়ে উঠ বসল, কোনো যুক্তিতেই তাকে নামানো গেল না ... ” (পৃ. ২১০)

এর মধ্যে আর মজার কী আছে? আসল মজা শুরু হয় চলতে চলতে। গাড়িতে কেউ একজন খাবারের কথা তুললেন। তিন-চার দিন বাইরে থাকতে হতে পারে ...। দেখা গেল সকলেরই পকেট গড়ের মাঠ। ত্রুসিশকাই খাবার কিনে আনলেন। যথাস্থানে পৌঁছে কমান্ডান্ট-এর কাছে জানা গেল, ‘সব ঠিক আছে কমরেড, সৈন্যদের

মেজাজ চমৎকার ... শুধু একটা ব্যাপার, গুলিবারুদ কিছু নেই আমাদের ...।’

তাতে অসুবিধের কিছু নেই। এক কমিশার জানালেন, ‘স্মোলনিতে দু’শ কোটি রাউণ্ড আছে। আপনাকে একটা অর্ডার লিখে দিচ্ছি।’

“কিন্তু হায়! কারুর কাছে এক চিলতে কাগজ নেই, পেনসিলও না। ‘ক্রুসিশকাকে তার নোটবইটা দিতে হল। ... বলাই বাহুল্য এ জনতার মধ্যে একমাত্র পেনসিলটি ছিল ক্রুসিশকার কাছেই ...’ (পৃ. ২১০-২১১)

অন্য উদাহরণটি আরও চমৎকার। মস্কোয় অনেক কষ্টে ন্যাশনাল হোটেল-এ ঠাঁই জুটেছে রীড-এর। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা। ‘খাবার খেলাম এক নিরামিষ রেস্তোরাঁ-তে; খুবই হাতছানি দেওয়া তার নাম – “আমি কাউকে খাই না!” দেয়ালে [লিও] তলস্তয়ের ছবি।’ (পৃ. ২৭৫)

রীড-এর তারিফ করে ক্রুপস্কায়া বলেছিলেন রাশিয়ার ভাষা বা রীতিনীতি কিছুই না জেনেও রীড এই বইটি লিখতে পেরেছিলেন, তার কারণ তিনি উদাসীন দর্শক মাত্র নন, মনেপ্রাণে তিনি এমন একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট, যিনি ঘটনাগুলোর মানেটা, মহা সংগ্রামের মানেটা বোঝেন। এই বোধ থেকেই এসেছে তাঁর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যা ছাড়া এমন বই লেখা অসম্ভব হত।’ (পৃ. ৯)

ক্রুপস্কায়া যদি রীড-এর রুশভাষায় অজ্ঞতার কথা না জানাতেন তাহলে হয়তো পাঠক সে-কথা বুঝতেনই না। প্রতিটি রুশ পত্রিকা, ইস্তাহার, পুস্তিকা ইত্যাদি অজস্র উল্লেখ থেকে বরং মনে হয় – রুশভাষায় রীড-এর রীতিমতো দখল ছিল। ঘটনা অবশ্য তা নয়; ক্রুপস্কায়া ঠিকই বলছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে – রুশ না-জানলেও ফরাসি ও জার্মান রীড ভালোই বুঝতেন। আর এই দুটি-ভাষা-জানা লোক শিক্ষিত রুশ সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন সহজেই পাওয়া যেত। তেমন কয়েকজনের কথা রীড-এর বইতেই আছে (পৃ. ২৫০, ২৫৫, ২৬৫, ২৭১)।



Figure 1রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

একই সঙ্গে কৌতুক আর সুগভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটে নিচের এই বিবরণে –

> "ঠিক ১০টা ৩৫ মিনিটে কামেনেভ ঘোষণার পক্ষপাতীদের কার্ড তুলতে বললেন। বিরুদ্ধে হাত তোলার সাহস করেছিল একজন, কিন্তু চারপাশে প্রচণ্ড হৈচৈ হতেই চট

> করে সে হাত নামিয়ে নেয় ... সর্ববাদী সম্মত। হঠাৎ যেন এক যৌথ স্বতঃচেতনায় দেখা গেল সবাই আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি, একসঙ্গে গলা মেলাচ্ছি 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের মসৃণ দোলায়িত ঐকতানে। ... আর এ গান শেষ হবার পর একটা সচকিত স্তব্ধতায় যখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তখন হলের পেছন থেকে কে যেন হাঁক দিলে, 'কমরেড, মুক্তির জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মরণ করি আসুন!' শুরু হল সেই অন্ত্যেষ্টি মার্চ—সেই ধীর, বিষণ্ণ তবু জয়জয়ন্তী এক স্তোত্র, একেবারে রুশী, অথচ কী মর্মস্পর্শী। 'আন্তর্জাতিকের' সুরটা যতই হোক বিদেশী, কিন্তু অন্ত্যেষ্টি মার্চটা যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন নরপিণ্ডের একেবারে প্রাণের কথা যাদের প্রতিনিধিরা আজ এই সভাকক্ষে বসে তাদের আবছা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে গড়ে তুলছে এক নতুন রাশিয়া এবং হয়ত আরো কিছু।"(পৃ. ১৬২)

ব্রীড-এর বিবরণে কোনো শস্তা উচ্ছ্বাস নেই। বিপ্লবের পথ যে ফুল-বিছনো ছিল না, বরং কাঁটা ছড়িয়ে ছিল প্রতি পদে—তার নমুনা বইটিতে বারবার পাওয়া যায়। বলশেভিক পার্টির ভেতরে ও বাইরে ক্রমশ সংঘাত চলেছে; ৭ নভেম্বরের আগে ও পরে সর্বক্ষণ চলেছে তর্ক-বিতর্ক। এই সবকিছুর মধ্যে অটল রয়েছেন নিকোলাই লেনিন। ৩ নভেম্বর বলশেভিক নেতাদের ঐতিহাসিক বৈঠকে লেনিন বললেন—সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে—

> “৬ই নভেম্বর খুবই আগে হয়ে যাবে ... অন্যদিকে ৮ই নভেম্বর খুবই দেরি হয়ে যাবে ... আমাদের ঘা মারতে হবে ৭ তারিখেই, যেদিন কংগ্রেস শুরু হবে, যাতে কংগ্রেসকে আমরা বলতে পারি ‘এই রইল ক্ষমতা! বলুন কী করবেন?’” (পৃ. ৮৯)

স্বতঃস্ফুর্ততা নয়, সংগঠন; আকস্মিক প্রেরণা নয়, সুচিন্তিত পরিকল্পনা—এই ছিল নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যর মূল উৎস। লেনিন যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছেন তখনই ঐ বাড়ির ওপরের তলায় একটি ঘরে বসে আছেন ‘লম্বা চুল একটি লোক, রোগা রোগা মুখ—এককালে ছিলেন জার সৈন্যবাহিনীর অফিসার, পরে বিপ্লবী এবং নির্বাসিত, কোন এক ওভ্‌সেয়েঙ্কো, ওরফে আন্তোনভ, গণিতবিদ্, দাবাড়ে; রাজধানী দখলের নিখুঁত পরিকল্পনা ছকছেন তিনি।’ (পৃ ৮১)

শুধু সাহিত্যকর্ম হিসেবে যদি বইটির বিচার করা হয় তাহলেও দেখা যাবে – দু-চার কথায় বিপ্লবের কুশীলবদের—কী সামনের আর কী পেছনের সারির—এমন নিখুঁত বর্ণনা পেশাদার লেখকরাও এত স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন না। সবার ওপরে অবশ্য দেখা দেন লেনিন। রীড-এর বর্ণনা –

> “বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মস্ত এক টেকো ঢিপকপালী মাথা কাঁধের ওপর শক্ত করে বসানো। ছোটো ছোটো চোখ,

বোঁচাটে নাক, চওড়া উদার মুখ, ভারি চিবুক; মুখটা তখন কামানো, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সেই সুপরিচিত দাড়ি খোঁচা খোঁচা গজিয়ে উঠেছে। পরনে জীর্ণ পোষাক, ট্রাউজার জোড়া বেমানান লম্বা। জনতার প্রিয়পাত্র হবার দিক থেকে একেবারেই দাগ কাটার মতো চেহারা নয়, অথচ যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি পেয়ে গেছেন তা বোধ হয় ইতিহাসের খুব কম নায়কের ভাগ্যেই জুটেছে। অদ্ভুত একজন নেতা—যিনি নেতৃত্ব করছেন একান্তই তাঁর মেধার জোরে; অরঙ্গীন, অরসিক, অটল, অনাসক্ত, এমনকি চমকপ্রদ কোনো পাগলামিও যাঁর কিছু নেই, কিন্তু আছে গভীরতম ভাবনাকে সহজে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নিখুঁত বিশ্লেষণের শক্তি। বিচক্ষণতার সঙ্গে মিলনে যা এক মেধাশক্তির মহত্তম স্পর্ধা।" (পৃ. ১৫৫-৫৬)

এর চেয়ে সঠিকভাবে লেনিন-এর পরিচয়, লেনিন কীসে লেনিন, দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। জৌলুস নেই, নাটুকেপনা নেই, আছে শুধু মেধার জোর—এমন জননেতা লেনিন-এর আগে সত্যিই পৃথিবীর কোথাও দেখা যায়নি।

'নভেম্বর বিপ্লব – জন রীড-এর চোখে' লেখাটি 'কোরক: নভেম্বর বিপ্লব : শতবর্ষে ফিরে দেখা (শারদ ২০১৭)' থেকে সংগৃহীত।

—

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা নীচে দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।

নভেম্বর সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ

Email: yuktibadira@gmail.com

